Courtesy: Bharatiya Sambidhan O Rajniti,By Pranab Kumar Dalal, Book Syndicate Pvt. Ltd

১৪.২ ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক
Relation between Religion and Politics

ধর্ম এবং রাজনীতি—এ দুটি বিষয় একে অপরের থেকে আলাদা। ধর্ম হল আধ্যাত্মিক জগতের বিষয়, আর রাজনীতি হল বাস্তব জগতের বিষয়। প্রথমটি অপার্থিব, দ্বিতীয়টি পার্থিব। এতদ্‌সত্ত্বেও এ দুটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। এদের মধ্যে একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে এবং অপরটির দ্বারা প্রভাবিত হয়।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐশ্বরিক মতবাদটি (Divine Origin Theory) ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ওপর জোর দেয়। এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট এবং তাঁর ইচ্ছায় পরিচালিত। রাজা হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি। রাজার আদেশ হল ঈশ্বরের আদেশ। সুতরাং রাজার আদেশ অমান্য করার অর্থ ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করা।

প্রাচীনকালে ভারত, মিশর, চিন, জাপান এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে মনে করা হত। প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও ধর্ম স্বতন্ত্র বিষয় ছিল না। ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার প্রাণকেন্দ্রে ধর্মের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা পরলোক এবং ঈশ্বর সম্পর্কিত আলোচনায় আবৃত ছিল। প্রাচীন হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। হিন্দু পুরাণ অনুসারে বহু রাজারই জন্ম দেবতার অংশ থেকে। কারও উৎপত্তি সূর্য থেকে, কারও বা চন্দ্র থেকে। যুধিষ্ঠিরকে বলা হয় ধর্মপুত্র। মহাভারতের 'শান্তিপর্বে' রাজাকে ঈশ্বরের জ্ঞানে মান্য করতে বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ব্রাউন (D. M. Brown) তাঁর "*The White Umbrella : Indian Political Thought from Manu to Gandhi*" শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন, প্রাচীন ভারতে ধর্মই ছিল রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি এবং রাষ্ট্র ছিল ধর্মরাষ্ট্র। তদানীন্তনকালে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে ক্ষত্রিয়রা শাসন ক্ষমতার অধিকারী হতেন, অর্থাৎ রাজপদ লাভ করতেন। আবার হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথা অনুসারে ক্ষত্রিয়দের ওপর ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হত। **ঋগ্‌বেদে** বলা হয়েছে, সেই রাজাই তাঁর প্রজাদের ওপর কর্তৃত্ব কায়েম রাখতে পারবেন এবং শত্রুপক্ষকে পর্যুদস্ত করতে পারবেন, যিনি তাঁর রাজ্যের পুরোহিত সম্প্রদায়কে সম্যক মর্যাদা প্রদান করবে। **'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'** বলা হয়েছে যে, রাজা যতদিন পুরোহিতের অধীনস্থ থাকবেন, ততদিন তাঁর রাজ্যের সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত থাকবে। **'গৌতম ধর্মসূত্রে'**ও বলা হয়েছে, কুল পুরোহিতের সমর্থন ব্যতিরেকে রাজার সমৃদ্ধি সম্ভব নয়।

এই **পুরোহিততান্ত্রিক প্রবণতা** আনুমানিক এক হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তবে তৎকালে ভারতের সব রাজাই যে এই প্রবণতাকে মেনে নিয়েছিলেন এমন নয়। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ক্ষত্রিয়দের, রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিরোধের ঘটনা মোটেই বিরল ছিল না। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে রাষ্ট্রের ওপর থেকে পুরোহিততন্ত্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পেতে থাকে। খ্রিস্টিয় আমলের শুরু থেকে রাজবংশীয় ব্যক্তিবর্গ বেদবিদ্যা ও ধর্মীয় পাঠের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি বিষয়ক শাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করেন। তবে ধর্মের কর্তৃত্ববাদী ধারণা থেকে হিন্দু-রাষ্ট্রদর্শন কখনও পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি।

প্রাচীন **চিনদেশের** ধর্মীয় বিধান অনুসারে দেশের নিরাপত্তা রক্ষা এবং বন্যা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে প্রজাগণকে রক্ষার দায়িত্ব ছিল সম্রাটের ওপর। রাজা তাঁর দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে মনে করা হত যে, তিনি শাসনের জন্য ঈশ্বরের অনুমোদন হারিয়েছেন। **মিশরীয়রা** রাজাকে সূর্যের পুত্র বলে মনে করত এবং পুজো করত। খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থেও রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলা হয়েছে। প্রাচীন **খ্রিস্টান চিন্তাধারা** অনুসারে মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ঈশ্বর রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন। প্রাচীন হিব্রু চিন্তাতেও এই মতবাদের সমর্থন পাওয়া যায়।

মধ্যযুগেও ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অব্যাহত থাকতে দেখা যায়। সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী ইউরোপের বিভিন্ন অংশে চলেছে রাষ্ট্রের সঙ্গে চার্চের, রাজার সঙ্গে পোপের বিরোধ বা সংঘর্ষ। এই বিরোধের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল যে প্রশ্নটি সেটি হল রাজা এবং পোপ এই দুজনের মধ্যে কে প্রকৃত ঈশ্বরের প্রতিনিধি? উভয়েই নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে দাবি করতে থাকেন। চার্চ ও রাজশক্তির বিরোধিতাকে কেন্দ্র করেই সেন্ট বার্নার্ড প্রচার করেছিলেন **'দ্বি-তরবারি তত্ত্ব'** (Theory of two swords), সলস্‌বেরি প্রচার করেছিলেন **'আত্মা ও মস্তিষ্কের সংযোগের ধারণা'**, দান্তে প্রচার করেছিলেন **'দ্বৈত কর্তৃত্বের ধারণা'** ইত্যাদি। **সেন্ট আগাস্টাইন** বলেন,

Scanned by CamScanner

প্রকৃত জনরাষ্ট্রকে অতি অবশ্যই খ্রিস্টধর্মভিত্তিক হতে হবে। **সেন্ট টমাস এ্যাকুইনাস** বলেন, রাজার ক্ষমতা ঈশ্বরদত্ত হলেও তাঁকে ধর্মীয় আইনের অধীনে থেকে কাজ করতে হয়। **সেন্ট অ্যামব্রোস** বলেন, রাজা চার্চের অন্তর্গত, চার্চের উর্ধ্বে নয়। এইভাবে মধ্যযুগের অধিকাংশ লেখাতেই রাজশক্তির ওপর ধর্মের প্রাধান্যকে সমর্থন করা হয়। তবে আধুনিক যুগের সূচনায় রাজাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হন এবং তাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্তমান যুগে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আগের তুলনায় অনেকখানি শিথিল হয়েছে। প্রাকৃতিক কার্যকারণ সূত্র, প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিকাশ ইত্যাদি পরবর্তীকালে প্রকৃতির ওপর মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ফলে, ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণের বদলে মানুষের সামাজিক,রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রাধান্য দেখা যায়। ধর্ম ও অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তি ও জ্ঞানের সাহায্যে মানুষের জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। ফলে রাজনীতিতেও পরিবর্তন দেখা যায়। ধর্মীয় রাজনীতির বদলে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি ও পার্থিব বিষয় থেকে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়কে পৃথক করা হয়েছে এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক জীবনে ধর্মের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে।

আধুনিক যুগের বেশিরভাগ রাষ্ট্রই ধর্মনিরপেক্ষ। বস্তুতপক্ষে আধুনিক রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে ধর্মবিরোধী বা অধার্মিক রাষ্ট্রকে বোঝায় না। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে সেই রাষ্ট্রকে বোঝায় যেখানে সমাজ ও রাজনীতির ওপর থেকে ধর্মের পরম্পরাগত প্রভাবকে দুর্বল করা হয়েছে, যেখানে রাজনীতিকে ঈশ্বর ও ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র করা হয়েছে, যেখানে রাষ্ট্রীয় কাজে ধর্মীয় বিবেচনার পরিবর্তে মানুষের কল্যাণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সর্বোপরি যেখানে বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র' বলে ঘোষণা করা হয়ছে। ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সংবিধানের ২৫-২৮ নং ধারাগুলিতে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি জানানো হয়েছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও ভারতে রাজনীতিকে ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র রাখা হয়নি। বরং রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের মাখামাখিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রায় সকল ভারতীয় রাষ্ট্র দার্শনিকের চিন্তায় ও কর্মে রাজনীতি ও ধর্মের সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে ধর্মকে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে উজ্জীবিত করার প্রয়াসে **বঙ্কিমচন্দ্র** দেশমাতৃকাকে দেবীরূপে কল্পনা করেছেন এবং দেশবাসীকে সেই দেবীর আরাধনায় উদ্বুদ্ধ হতে আহ্বান জানিয়েছেন। **শ্রী অরবিন্দের মতে,** যাঁরা বলেন ধর্ম ও রাজনীতি মানুষের জীবনের দুটি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন দিক এঁরা শুধুমাত্র হাসির খোরাক জোগান। **মহম্মদ আলি জিন্নার মতে,** রাজনীতিকে কখনও ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা যায় না। তিনি অজস্র উদাহরণ সহযোগে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে পৃথিবীতে সকল দেশেই ধর্মকে ভিত্তি করে জাতি গড়ে উঠেছে ; আবার এই ধর্মীয় ঐক্যের অভাবে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক একই স্থানে দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করেও এক অভিন্ন জাতি হিসাবে গড়ে ওঠেনি। উদাহরণস্বরূপ স্পেনের মুসলমান ও খ্রিস্টানরা ৮০০ বছর ধরে পাশাপাশি বাস করলেও তাদের মধ্যে অভিন্ন জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠেনি। **গান্ধিজির মতে,** রাজনীতি ধর্মহীন হতে পারে না। ধর্মবিবর্জিত রাজনীতিকে তিনি এমন একটি মৃত্যুফাঁদ বলেছেন যা মানুষের আত্মাকে হত্যা করে ("There are no politics devoid of religion. Politics bereft of religion is a death-trap that kills the soul.") তিনি আরও বলেন, ধর্মাচরণের উদ্দেশ্য হল সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে একাত্ম হওয়া এবং রাজনীতি ব্যতীত তা সম্ভব নয়।

বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের আচরণেও সংকীর্ণ ধর্মবিশ্বাসকে প্রশ্রয় পেতে দেখা যায়। ধর্মীয় মৌলবাদের তাণ্ডবে দেশ যখন বিপর্যস্ত, তখন দেখা যায় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী প্রভৃতি ভারতের রাজনৈতিক পদাধিকারীগণ বেশ ঢাক-ঢোল পিটিয়ে মন্দির-মসজিদে ছুটছেন। রাজনৈতিক নেতারা মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলছেন, অথচ নির্বাচনি প্রচারে নামবার আগে বিশেষ বিশেষ ধর্মগুরু অথবা মৌলবাদীদের পায়ে মাথা ঠুকেছেন। ধর্মীয় নেতারাও এই সুযোগকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা নিজেদের ধর্মীয় গণ্ডিতে আবদ্ধ না রেখে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে উঠে আসছেন। নির্বাচনের সময় এঁরা নিজ নিজ ধর্ম সম্প্রদায়ের কাছে ভোটের জন্য

Scanned by CamScanner

আবেদন রাখছেন। মন্দির, মসজিদ, গুরুদুয়ারা, গীর্জা প্রভৃতি ধর্মস্থানগুলিতে ধর্মীয় আলোচনার পাশাপাশি রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা স্থান পাচ্ছে। বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলিকে ধর্মীয় দল বা গোষ্ঠীর সঙ্গে সমঝোতা করতে দেখা যাচ্ছে। নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে, মন্ত্রীসভা গঠনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিচার-বিবেচনাকে প্রাধান্য পেতে দেখা যাচ্ছে। এমনকি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও ধর্ম সম্প্রদায়ের কথাটি মাথায় রাখা হচ্ছে। হিন্দু মৌলবাদকে তুষ্ট করার জন্য অযোধ্যায় বিতর্কিত রাম মন্দিরের শিলান্যাস করা হয়। আবার মুসলিম মৌলবাদকে সন্তুষ্ট করার জন্য ঐতিহাসিক শাহবানু মামলায় প্রদত্ত সুপ্রিমকোর্টের রায়কে অগ্রাহ্য করে 'মুসলিম মহিলা (সংরক্ষণ) আইন' পাশ করা হয়। ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত অটল বিহারী বাজপেয়ীর সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রে গৈরিকীকরণের আদর্শ গ্রহণ করেছে। এই সরকারের আমলে কম্পিউটারের পাশাপাশি জ্যোতিষচর্চার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। সত্তরের দশক পর্যন্ত ভারত রাষ্ট্রের একটা সর্বস্বার্থরক্ষাকারী ভাবমূর্তি ছিল। কিন্তু ৮০-র দশক থেকে হিন্দু-মুসলিম উভয় মৌলবাদই যেন হঠাৎ করে অতি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক বাজার অর্থনীতির চাপে রাষ্ট্রের কর্মপরিধি সংকুচিত হয়েছে, যদিও তার পীড়নমূলক ভূমিকা অব্যাহত থেকেছে। ফলে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবধান বেড়েছে, আর এই অন্তর্বর্তী স্থানটিতে (যাকে বলা হয় পুরসমাজ) প্রাধান্য বিস্তারের জন্য মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। 'ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে ধর্মসাপেক্ষ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ-বর্জনই এখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।' তবে ভারতের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল যেহেতু ধর্ম ছাড়াও ভাষা, জাতপাত, আঞ্চলিকতা ইত্যাদি নানা উপাদানের জটিল মিশ্রণে নির্মিত, যেহেতু এখানে ধর্মচেতনা এককভাবে রাষ্ট্রের ওপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়নি এবং অদূর ভবিষ্যতেও সেরকম ঘটার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

শুধু ভারতেই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও কমবেশি রাজনীতি ও ধর্মের ঘনিষ্ঠতা লক্ষ করা যায়। **ইসলামীয় রাষ্ট্রগুলিতে** রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মের প্রাধান্য সু-প্রতিষ্ঠিত। মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদদের উলেমা বলা হয়। তাঁরা শরিয়ৎ ব্যাখ্যা করেন এবং সেই ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা রাজনৈতিক নেতাদের থাকে না। ইরানের প্রয়াত ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লা খোমেইনি ফতোয়া দিলেন, সলোমন রুশদির গর্দান নিতে হবে। অপরাধ, তিনি নাকি তাঁর **'স্যাটানিক ভার্সাস'** নামক পুস্তকে পবিত্র কোরানের অপব্যাখ্যা করেছেন। আফগানিস্তানের তালিবান শাসকগণ সংকীর্ণ ধর্মীয় বিশ্বাসে প্রভাবিত হয়ে নারী জাতিকে নানাবিধ মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন।

ইসলামীয় রাষ্ট্রগুলিই শুধু নয়, **ইউরোপ ও আমেরিকাতেও** রাজনীতি পুরোপুরি ধর্মের প্রভাবমুক্ত নয়। সংগঠিত খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা ইউরোপ ও আমেরিকায় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি। ইহুদি ধর্ম, চরমপন্থী ক্যাথলিক মতবাদ এখনও বিভিন্ন দেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

একালের ধর্মচর্চায় ঈশ্বর বিশ্বাসের গভীরতা কমছে, কিন্তু বাড়ছে ধর্মের আড়ম্বর এবং তার বহিরঙ্গের চটুলতা। উন্নত প্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিক গণমাধ্যমের ব্যবহারে এই অগভীর ধর্মবিশ্বাস বিশ্বের নানা প্রান্তে রাজনীতি ও সমাজচর্চার এক নতুন আঙ্গিকের প্রবর্তন করছে। এখন ধর্মীয় মৌলবাদীদের নিয়ম করে মন্দির, মসজিদ, গির্জায় যেতে হয় না ধর্ম-চেতনাকে সমৃদ্ধ করা জন্য। পরিবর্তে তাদের কাছে বেশি জরুরি হল অর্থবল বাড়ানো এবং বিশ্বজনমতের আনুকুল্য লাভের জন্যে দেশ-দেশান্তরে কর্মকেন্দ্র স্থাপন। উদাহরণস্বরূপ সারা ভারত শিখ ছাত্র ফেডারেশনের কর্মস্থল রয়েছে কানাডায়, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রচারকেন্দ্র রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এরা স্থানিকতার চর্চা করে আন্তর্জাতিক রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে। সাম্প্রতিককালে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মাত্রাতিরিক্ত আত্মসচেতনতা ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্ককে উত্তরোত্তর তিক্ত ও জটিল করে তুলেছে। ধর্মের নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি, ভিনদেশে অনুপ্রবেশ, বিভিন্ন ধর্মীয় কুসংস্কারকে জোর করে (তালিবানি কায়দায়) সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া—ইত্যাদি মৌলবাদী সংগঠনগুলির নিয়মিত কর্মকাণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। আফ্রো-এশিয়ার বেশিরভাগ দেশের সাধারণ মানুষ অশিক্ষিত, দরিদ্র এবং ধর্মভীরু হওয়ার জন্য এই ধর্মীয় সংগঠনগুলির প্রতি তাদের একটা স্বাভাবিক আনুগত্যবোধ জন্মায়। এই আনুগত্যকে কাজে লাগিয়ে এবং আধুনিকতার নানা উপাদান ব্যবহার করে এই সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠী আধুনিকতাবিরোধী সনাতন ধর্মমত ও বিশ্বাসের প্রচার ও প্রসারে উদ্যোগী হয়। এইভাবে তারা শ্রেণিচেতনাকে অবদমিত রেখে সম্প্রদায়মনস্কতাকে বাড়িয়ে তুলতে

Scanned by CamScanner

সচেষ্ট থাকে। ইসলামি সংগঠনগুলির এই শ্রেণি নিরপেক্ষ অবস্থান আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির ব্যাপারীদের চলার পথকে নিষ্কন্টক করে তোলে। স্বাভাবিকভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বায়িত পুঁজির সঙ্গে ধর্মীয় মৌলবাদের এক বিচিত্র সহাবস্থান ঘটে যায়।

উপসংহার : সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কী প্রাচীন যুগ, কী মধ্যযুগ, কী আধুনিক যুগ—প্রতিটি যুগেই এবং প্রতিটি দেশেই ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। পুঁজিবাদের উত্থান ও বিকাশ, শিল্পায়ন, নগরায়ণ, ভোগবাদ, সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব, শ্রেণিচেতনার বিকাশ, ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের বিস্তার—কোনোকিছু ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেনি অথবা ধর্মচর্চাকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আটকে রাখতে পারেনি।

১৪.৩ ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ
The Meaning of Secularism

শব্দগত অর্থে 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলতে বোঝায় এমন কিছু যার সঙ্গে ধর্ম বা ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়ের কোনো সম্পর্ক নেই এবং যা পুরোমাত্রায় পার্থিব ("..... anything which is distinctly opposed to or not connected with religion or ecclesiastical things, temporal as opposed to spiritual or ecclesiastical"—Encyclopaedia Britannica)। **A New English Dictionary**-তে বলা হয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতা হল 'ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা' (absence of connection with religion)। **লিও ফেফার** (Leo Pfeffer) তাঁর *Church, State and Freedom* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে পৃথকীকরণকে (separation of the state and the church) বোঝায়। **The Chamber's Dictionary**-তে বলা হয়েছে, যে, ধর্মনিরপেক্ষতা হল এই বিশ্বাস যে রাষ্ট্র, নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র হবে।

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হল ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে পৃথকীকরণ। কিন্তু অনেকে ধর্মনিরপেক্ষতার এরূপ অর্থকে গ্রহণ করেন না। তাঁদের মতে, এ হল ধর্মনিরপেক্ষতার সংকীর্ণ অর্থ। **এম. এইচ. বেগ** (M. H. Beg) তাঁর *Islamic Jurisprudence and Secularism* শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ শুধুমাত্র ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক করা নয়, বরং ধর্মনিরপেক্ষতা হল বিশ্বের মানুষের কল্যাণের জন্য সেইসব চিন্তা ও কাজ, যেখানে ঈশ্বর বা অতীন্দ্রিয় শক্তির হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করা হয় না, এমনকি তাদের উল্লেখও করা হয় না। *The Oxford English Dictionary*-তে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে সেই মতবাদ (doctrine)-কে বোঝানো হয়েছে যা মনে করে সমাজের নীতিবোধ তৈরি হবে মানুষের ইহজগতের ভালোমন্দের বিচারে, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা হল সেই আদর্শ যা ঈশ্বরকে নয়, মানুষকে যাবতীয় জাগতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করে এবং একই সঙ্গে রাজনীতিকে ঈশ্বর ও ধর্ম থেকে আলাদা করে রাখে। **দামলি** (Y. B. Damle) তাঁর *Process of Secularization* শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কেবল রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে পৃথকীকরণকেই বোঝায় না, সেই সঙ্গে আরও কিছু বিষয়কে বোঝায়, যেমন—(i) যুক্তিবাদ ও বোধশক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ, (ii) বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, (iii) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, (iv) সর্বজনীনতা এবং জাতপাত, অঞ্চল, ধর্ম প্রভৃতির প্রতি আনুগত্যহীনতা, (v) আইনের অনুশাসন ইত্যাদি। **লুথেরা** (V. P. Luthera) তাঁর *The Concept of Secular State and India* গ্রন্থে বলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষতা হল একান্তভাবেই বস্তুবাদী বিষয় যার কেন্দ্রীয় বিষয় হল মানুষের উন্নতি, আর এই উন্নতি ঘটতে পারে শুধুমাত্র বস্তুবাদী পথে, আধ্যাত্মিক পথে নয়। এককথায় বলা যেতে পারে, ধর্মনিরপেক্ষতা হল এমন একটা মানবতাবাদী আদর্শ যা ঈশ্বরের পরিবর্তে মানুষকেই সার্বভৌম বলে মনে করে, যা সম্পূর্ণভাবে পার্থিব এবং যা বিশ্বাস করে যে মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যনির্মাতা। **পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রগুলিতে** এই অর্থেই ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করা হয়েছে।

'ধর্মনিরপেক্ষতা' এবং 'ধর্মনিরপেক্ষীকরণ' এ দুটিকে অনেক সময় সমার্থক শব্দ হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়। কিন্তু এ দুটি শব্দ এক বা অভিন্ন নয়। **ভি. এন. দেশপাণ্ডে** (V. N. Deshpande)-এর মতে, ধর্মনিরপেক্ষতা হল একটি মতাদর্শ, আর ধর্মনিরপেক্ষীকরণ হল একটি প্রক্রিয়া (a process)। **ব্রায়ান উইলসন** (Bryan R. Wilson)

Scanned by CamScanner

প্রায় একইভাবে বলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষীকরণ হল এমন একটি প্রক্রিয়া, যাতে ধর্মীয় চেতনা, কার্যকলাপ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সামাজিক তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। এই প্রক্রিয়ার ফলে সমাজের অতিপ্রাকৃত এজেন্সিগুলির নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ে এবং সমাজের কাজকর্ম বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। **পিটার বার্জার** (Peter Berger) বলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষীকরণ হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রগুলিকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও প্রতীকসমূহের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করা হয়।

১৪.৪ ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃতি
The Nature of Secularism in India

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সংবিধানের ২৫-২৮ নং ধারাগুলিতে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ১৫ নং ধারায় ধর্ম, জাতি, বর্ণ প্রভৃতির ভিত্তিতে নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, সংবিধানের ১৬নং ধারায় সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সংবিধানের ১৭ নং ধারায় অস্পৃশ্যতার আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কিন্তু ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ কথাটি একটু ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয়। এখানে ধর্মনিরপেক্ষ বলতে সকল ধর্মকে সমান মর্যাদা দেওয়াকে বোঝানো হয়। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম রূপকার **আয়েঙ্গার** (G. Ayyangar) ১৯৪৮ সালের ৭ ডিসেম্বর গণপরিষদে বলেন, "আমরা একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চাই। ধর্মনিরপেক্ষ বলতে আমরা একথা বোঝাতে চাইছি না যে, কোনো ধর্মের প্রতি আমাদের বিশ্বাস নেই এবং আমাদের জীবনে এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। ধর্মনিরপেক্ষ কথাটির অর্থ হল রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মকে সাহায্য বা পৃষ্ঠপোষকতা করবে না এবং এক ধর্ম অপেক্ষা অন্য ধর্মকে প্রাধান্য দেবে না"। ১৯৭৬ সালের ১৬ অক্টোবর নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক কন্‌ভেন্‌শনে ভাষণদানকালে তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি **দেবকান্ত বড়ুয়া** মন্তব্য করেন, "সব ধর্মের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। দেশের মধ্যে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সব সম্প্রদায়ের সমান মর্যাদা ও সম্মান রক্ষায় রাষ্ট্র অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।"

ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ এবং প্রকৃতি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন গণপরিষদের সদস্য **পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র**। ৬ ডিসেম্বর, ১৯৪৮, গণপরিষদে এই প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে **শ্রী মৈত্র** মন্তব্য করেন, "ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে বোঝায় রাষ্ট্র ধর্ম বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে কোনোরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। কোনো বিশেষ ধর্ম রাষ্ট্র থেকে বিশেষ আনুকূল্য পাবে না। কোনো বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের লোক বলে রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিকে বাড়তি সুযোগসুবিধা দেবে না। একই সঙ্গে এটাও দেখতে হবে যে কোনো ব্যক্তি যেন তার পছন্দমতো ধর্ম প্রচার ও অনুসরণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়।" ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম রূপকার **আম্বেদকর** (Dr. B. R. Ambedkar) বলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অর্থ হল রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মকে জনগণের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেবে না। ভারতীয় সংবিধানের অপর এক স্থপতি **পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু** বলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মের বিরোধিতা করা নয়। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হল সেই রাষ্ট্র যা সকল ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধাশীল এবং সকল ধর্মকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। এই ধরনের রাষ্ট্র নিজেকে কোনো বিশেষ ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত করে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে পশ্চিমি গণতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাকে যে অর্থে ব্যবহার করা হয়, ভারতবর্ষে তা হয় না। পশ্চিমি ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ রাষ্ট্র পরিচালনা, শিক্ষানীতি, রাজনীতি, নাগরিক অধিকার ইত্যাদি থেকে ধর্মকে আলাদা রাখা। ওখানকার ধর্মরিপেক্ষতার মূল লক্ষ্য হল সমাজ ও রাজনীতির ওপর থেকে ধর্মের পরম্পরাগত প্রভাবকে দুর্বল করা। কিন্তু ভারতবর্ষে ধর্মকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে রাখা হয় না এবং রাজনীতি, শিক্ষা ইত্যাদি থেকে ধর্মকে আলাদা করা হয় না। বিভিন্ন ধর্মকে রক্ষা করা বা তার সমন্বয় ঘটানো ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি নয়। র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট মুভমেন্টের সঙ্গে যুক্ত **ড. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের** মতে, "সব ধর্মকে সমান মর্যাদা দেওয়া, সব ধর্মের পূজাপার্বণে ছুটি থাকা চাই—এটা সেকুলার দর্শনের বিপরীত।" কিন্তু ভারতবর্ষে সেটাই করা হয়।

Scanned by CamScanner

ভারতবর্ষে সকল ধর্মকে সমান চোখে দেখা হয় এবং সবধর্মকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা হয়। সুতরাং বলা যায়, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা হল ধর্মীয় সহনশীলতা। **এখানে সর্বধর্ম সমন্বয়কেই ধর্মনিরপেক্ষতা বলে চালাবার চেষ্টা করা হয়।** বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রায় সকল ভারতীয় রাষ্ট্রদার্শনিকের চিন্তায় ও কর্মে রাজনীতি ও ধর্মের সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে উজ্জীবিত করার প্রয়াসে বঙ্কিমচন্দ্র দেশমাতৃকাকে দেবীরূপে কল্পনা করেছেন এবং দেশবাসীকে সেই দেবীর আরাধনায় উদ্বুদ্ধ হতে আহ্বান জানিয়েছেন। ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দ রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের মাখামাখিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। **শ্রী অরবিন্দ**-এর মতে, যাঁরা বলেন ধর্ম ও রাজনীতি মানুষের জীবনের দুটি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন দিক, তাঁরা শুধু হাসির খোরাক জোগান। **গান্ধিজি**-র মতে, রাজনীতি ধর্মহীন হতে পারে না। ধর্মবিবর্জিত রাজনীতিকে তিনি এমন একটি মৃত্যুফাঁদ (death-trap) বলেছেন যা মানুষের আত্মাকে (soul) হত্যা করে।

বর্তমানে ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের আচরণেও সংকীর্ণ ধর্মবিশ্বাসকে প্রশ্রয় পেতে দেখা যায়। ধর্মীয় নেতারাও নিজেদের ধর্মীয় গণ্ডিতে আবদ্ধ না রেখে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে উঠে আসছেন। মন্দির, মসজিদ, গুরুদুয়ার, গির্জা প্রভৃতি ধর্মস্থানগুলিতে ধর্মীয় আলোচনার পাশাপাশি রাজনীতি বিষয়ক আলোচনাও স্থান পাচ্ছে। নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে, মন্ত্রিসভা গঠনের ক্ষেত্রে, এমনকি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিচারবিবেচনাকে প্রাধান্য পেতে দেখা যায়। এককথায়, ভারতবর্ষে ধর্মকে রাজনীতি থেকে স্বতন্ত্র না করে ধর্মকে নিয়েই রাজনীতি করা হয়।

এই সমস্ত **দুর্বলতা** থাকলেও ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার এমন কতকগুলি **বিশেষ দিক** আছে যা নি:সন্দেহে অভিনব। ***প্রথমত,*** ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা উদার (Liberal)। একটি হিন্দু অধ্যুষিত দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় সংবিধান শুধুমাত্র জনগণের ধর্মীয় সাম্য ও স্বাধীনতার অধিকার নিশ্চিত করে ক্ষান্ত থাকেনি, বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার ও সুযোগসুবিধা সংরক্ষণও করে। উদাহরণস্বরূপ সংবিধানের ২৫নং অনুচ্ছেদে নাগরিকদের যে-কোনো প্রকার ধর্মগ্রহণ, ধর্মপালন ও ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা চরম নয়, শর্তসাপেক্ষ ("Indian Secularism is not absolute, it is qualified...")। কারণ এখানে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারটি ভোগ করতে হয় জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য, নীতিবোধ প্রভৃতিকে ক্ষুণ্ণ না করে। ধর্মীয় অধিকারের ওপর আরোপিত রাষ্ট্রীয় বাধানিষেধের যৌক্তিকতা নিরূপণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিচারবিভাগের ওপর।

তৃতীয়ত, ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা স্থাণু বা অচল (static) নয়, পরিবর্তনশীল (dynamic)। ভারতবর্ষ জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের আদর্শ গ্রহণ করেছে। তাই রাষ্ট্র জনস্বার্থে এমন আইন প্রণয়ন করতে পারে যা কোনো বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের অনুসৃত ঐতিহ্যবাহী নীতির পরিপন্থী ; প্রয়োজনে রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে নাগরিকদের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে। এইভাবে রাষ্ট্র হিন্দু বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে এমন সব আইন প্রণয়ন করেছে যা চিরাচরিত হিন্দু রীতিনীতির বিরোধী। মুসলমান সম্প্রদায় চাইলে তাদের জন্যও রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে পারে। ২২ আগস্ট, ২০১৭ সুপ্রিম কোর্ট তাৎক্ষণিকভাবে তিনবার 'তালাক' শব্দটি উচ্চারণের মাধ্যমে বিবাহিত মহিলাকে পরিত্যাগ করার ধর্মীয় বিধিকে অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করে। ৩০ জুলাই, ২০১৯, পার্লামেন্ট সুপ্রিমকোর্টের রায়ের সঙ্গে সংগতি রেখে 'তিন তালাক' প্রথাকে ফৌজদারি অপরাধ (criminal offence) —এই মর্মে আইন পাশ করে।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা ধ্রুপদি পশ্চিমি ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে স্বতন্ত্র হলেও, নানা দিক থেকে এটি অভিনব। এটি ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন একটি আদর্শ যা বার বার আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও গর্বের সঙ্গে টিকে আছে।

১৪.৫ ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার সমস্যা বা প্রতিকূলতা
The Problems or Challenges Faced by Secularism in India

ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা ধ্রুপদি পশ্চিমি ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে স্বতন্ত্র ; এটি ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সংবিধানে এবং রাষ্ট্রীয় নীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতাকে স্বীকৃতি জানানো

Scanned by CamScanner

হয়েছে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিস্টান প্রভৃতি নানা ধর্মাবলম্বী মানুষ এখানে পাশাপাশি বাস করে এবং স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ করে যেতে পারে। তবে সাম্প্রতিককালে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে। বস্তুতপক্ষে সুদীর্ঘকাল ধরে লালিত ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র আজ আক্রান্ত। সমকালীন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যাগুলি নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা হল :

(১) **ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি :** ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের অন্যতম প্রধান শর্ত হল ধর্মকে রাজনীতি থেকে স্বতন্ত্র রাখা। কিন্তু সমকালীন ভারতে তার উল্টোটাই হচ্ছে। এখানে ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা রাখার পরিবর্তে ধর্মকে নিয়েই রাজনীতি করা হচ্ছে। রাজনৈতিক নেতাদের আচরণে সংকীর্ণ ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। মুসলিম মৌলবাদকে সন্তুষ্ট করার জন্য ঐতিহাসিক শাহবানু মামলার রায়কে অতিক্রম করে মুসলিম শরিয়তি আইন পাস করা হয়; আবার হিন্দু মৌলবাদকে তুষ্ট করার জন্য অযোধ্যায় রাম মন্দিরের শিলান্যাস করা হয়। ভোটের সময় প্রার্থী নির্বাচনে ও নির্বাচনি প্রচারে ধর্মীয় আবেগকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। দেশের রাজনৈতিক নেতাদের সংকীর্ণ রাজনীতির স্বার্থে ইমাম, শঙ্করাচার্য, মোহান্তদের দ্বারস্থ হতে দেখা যায়।

(২) **মৌলবাদ :** ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জটি এসেছে হিন্দু ও মুসলিম মৌলবাদের তরফ থেকে। হিন্দু মৌলবাদীদের দাবি হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। তাঁরা মুসলমানদের বিদেশি বলে আখ্যায়িত করেছেন। অন্যদিকে মুসলিম মৌলবাদীরাও নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে আঁকড়ে ধরে আছেন। দীর্ঘকাল যাবৎ এদেশে বসবাস করেও তাঁরা অনেকে ভারতকে নিজ দেশ বলে ভাবতে পারেন না। তাঁরা মুসলমানদের নিজস্ব আইনকে জাতীয় আইনের থেকে আলাদা রাখতে চান এবং দেশে অভিন্ন দেওয়ানি আইন প্রণয়নের চরম বিরোধিতা করেন।

(৩) **আর্থিক অনগ্রসরতা :** ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল জনসাধারণের আর্থিক স্বাচ্ছল্য এবং মানবিক মূল্যবোধ। কিন্তু এ দুটি ক্ষেত্রেই ভারত যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে। এদেশের ৪০ শতাংশ মানুষ এখনও পর্যন্ত দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করছে। এই দরিদ্র, বঞ্চিত মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সংকীর্ণ ধর্মীয় বিশ্বাসের শিকার হয়। এই ধরনের মানুষের পক্ষে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক প্রথা, লোকাচার প্রভৃতির প্রভাব উপেক্ষা করে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে গ্রহণ করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে **এম. আর. এ. বেগ** (M. R. A. Baig) তাঁর *'The Muslim Dilemma in India'* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, নিজেদের সামাজিক ও ধর্মীয় পরিচিতির ব্যাপারে অতিমাত্রায় সচেতন ভারতীয় জনগণ ধর্মনিরপেক্ষ নীতিটিকে সাদরে গ্রহণ করবে এরূপ আশা করা সিদ্ধ ডিম দিয়ে ওমলেট তৈরির চেষ্টার মতোই অবাস্তব।

(৪) **সাম্প্রদায়িক দল, সংগঠন, সংবাদপত্র ইত্যাদি :** ভারতে এমন অনেক রাজনৈতিক দল, সংগঠন, সংবাদপত্র ইত্যাদি রয়েছে যেগুলি সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেয়, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টিতে প্ররোচনা দেয়। উদাহরণস্বরূপ মুসলিম লিগ, অকালি দল, শিবসেনা, প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলি এবং জামাতে-ই-ইসলাম, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্ট প্রভৃতি সংগঠনগুলি নিজেদের বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলে জাহির করে। এ ছাড়া অর্গানাইজার, স্বস্তিকা, অকালি পত্রিকা, সোবাত, সারসিক প্রভৃতি সংবাদপত্র রয়েছে যেগুলি ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশকে ধ্বংস করে।

(৫) **ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ :** ভারতীয় সংবিধানের ২৬নং ধারার ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে আদালত মঠ-মন্দিরে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু সেই নির্দেশ উপেক্ষা করে রাষ্ট্র মঠ-মন্দিরের প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করতে দ্বিধাবোধ করে না। এ ছাড়া রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ধর্মকে তাঁদের ব্যক্তিগত আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছেন না। রাষ্ট্রীয় নেতারা বেশ ঢাক-ঢোল পিটিয়েই এ মন্দির সে মন্দিরে ছুটছেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোকে বজায় রাখার জন্য যে দায়িত্ববোধের পরিচয় দেওয়া উচিত, ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে তা আশা করা যায় না। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর শুধু বাবরি মসজিদের কাঠামোটি ধ্বংস হয়নি, সেইসঙ্গে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোটিও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর এটি ঘটে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকারের নিস্পৃহ মনোভাব এবং দায়িত্ববোধের অভাবে। অত:পর কেন্দ্রে বি. জে. পি.-র নেতৃত্বে মোর্চা সরকার গঠিত হলে বজরঙ্ দল, শিবসেনা প্রভৃতি হিন্দু মৌলবাদী সংগঠনগুলির প্রভাব প্রতিপত্তি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ফলে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোটি এক বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে পড়ে।

Scanned by CamScanner

(৬) **আত্মসচেতন জাতিগোষ্ঠী :** ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অবস্থান লক্ষ করা যায়। এইসব জাতিগোষ্ঠীর প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ব্যাপারে ভীষণভাবে সচেতন। দক্ষিণ ভারতে এমন কিছু জাতিগোষ্ঠী রয়েছে যারা জাতব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থানকারী ব্রাহ্মণদের রান্না করা খাদ্য, এমনকি জল পর্যন্তও গ্রহণ করে না। **এস. এল. সিক্রি** ভারতীয় জাতিগোষ্ঠীগুলির এই স্বাতন্ত্র্যবোধকে ধর্মনিরপেক্ষতার পথে একটি বড়ো অন্তরায় হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

(৭) **বৈষম্যমূলক সংরক্ষণ নীতি :** ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত সংরক্ষণ নীতি অতিমাত্রায় বৈষম্যমূলক। তপশিলি জাতি ও উপজাতি এবং ঈঙ্গভারতীয় সম্প্রদায় সহ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির উন্নতির জন্য বিশেষ সুযোগ-প্রদানের ব্যবস্থা করা হলেও ভারতের মুসলমান, শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত অনগ্রসর মানুষদের জন্য কোনো বিশেষ সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে এইসব সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায় এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। আবার এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা উচ্চবর্ণ হিন্দুদের মনেও ক্ষোভের সঞ্চার করে। এইসব কারণে **মীরন ভাইনার** (Myron Weiner), **মার্ক গালান্টার** (Marc Galanter), **অরুণা আহমেদ** প্রমুখ লেখক ভারতের সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষতার অন্যতম প্রতিবন্ধক বলে মনে করেন।

(৮) **অভিন্ন দেওয়ানি আইনের অনুপস্থিতি :** ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার পথে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায় হল অভিন্ন দেওয়ানি আইনের অনুপস্থিতি। এখানে হিন্দুদের জন্য নানারূপ সংস্কারমূলক আইন (উদাহরণস্বরূপ হিন্দু-বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত আইন) প্রবর্তন করা হলেও মুসলমান বা অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য এই আইন প্রযোজ্য হয় না। ফলে মুসলমান তথা অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা, বিশেষ করে নারীজাতি, পুরোনো পুরুষশাসিত সমাজের প্রচলিত আইনের আওতার বাইরে আসতে পারে না। এ ব্যাপারে আদালতের রায়কেও পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের মাধ্যমে অগ্রাহ্য করা হয়। সরকারি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই ধরনের পক্ষপাতমূলক আচরণ ধর্মনিরপেক্ষতার পথে বাধা সৃষ্টি করে।

(৯) **ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার অভাব :** ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শকে তুলে ধরার মতো ব্যবস্থা ভারতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে নেই। বিভিন্ন পূজাপার্বণে ছুটি দেওয়া হয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যেই নানাবিধ ধর্মীয় উৎসব পালন করা হয়। এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভরতির আবেদনপত্রে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে তার ধর্ম, জাতি ইত্যাদি জানাতে হয়। এগুলি নি:সন্দেহে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে **কৌসার আজম** (Kousar Azam) তাঁর *'Political Aspects of National Integration'* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, ভারতের তরুণ ছাত্রছাত্রীদের মনে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শকে ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কোনো সদর্থক ভূমিকা নেই।

১৪.৬ সাম্প্রদায়িকতা : অর্থ ও প্রকৃতি
Communalism : Meaning and Nature

যে সকল সামাজিক ব্যাধি একটি জাতির দেহে দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি করে সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল সাম্প্রদায়িকতা। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি অঙ্গীকার সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাটি ভারতের রাজনীতিকে বিষাক্ত করে তুলেছে। শুধু ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর বহু দেশই এই মুহূর্তে সাম্প্রদায়িকতার বিষে আক্রান্ত।

এখন প্রশ্ন হল, সাম্প্রদায়িকতা বলতে কী বোঝায়। সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িকতা বলতে কোনো ধর্মমতের প্রতি গভীর প্রত্যয় বা অনুরাগকে বোঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো ধর্মমতের প্রতি বিশ্বাস বা অনুরাগকে সাম্প্রদায়িকতা বলা যায় না। বাস্তবে সাম্প্রদায়িকতা বলতে বোঝায় এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ ও প্ররোচনাদানমূলক কাজ। একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় কর্তৃক অন্য একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ভাব পোষণ এবং তার বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোই হল সাম্প্রদায়িকতা। **ভি. আর. মেহেতা** (V. R. Mehta) তাঁর *'Ideology, Modernisation and Politics in India'* গ্রন্থে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধকে সাম্প্রদায়িকতা বলে উল্লেখ করেছেন। **রবার্ট মেলসন এবং উলপে** (Melson and Wolpe) বলেছেন, কোনো সম্প্রদায়ের নিজ অস্তিত্বকে রাজনৈতিকভাবে জাহির করাই হল সাম্প্রদায়িকতা ("Communalism is the

Scanned by CamScanner

political assertiveness of a community to maintain its identity...")। সাম্প্রদায়িকতা হল একটা মতাদর্শ যা অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে নিজের ধর্মীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সাম্প্রদায়িকতার ধরন হল অন্তর্নিহিত শত্রুতা, যার ভিত্তি হল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্যহীন স্বার্থের সংঘাত। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক **বিপান চন্দ্র** তাঁর *Communalism in Modern India* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, সাম্প্রদায়িকতা হল এমন এক বিশ্বাস যে, একটি বিশেষ ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করলে সংশ্লিষ্ট ধর্মভুক্ত মানুষদের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে।

শ্রী সুধাংশু দাশগুপ্ত একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন যে সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞা খুব পরিষ্কার। সাম্প্রদায়িকতা মানে হল ধর্ম ও রাজনীতিকে মিশিয়ে ফেলা, শিক্ষা, প্রশাসন ও রাজনীতিতে কোনো একটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় চিন্তাধারাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং সেই ধর্মীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনা করা। রাজনীতিতে, প্রশাসন ব্যবস্থায় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মের হস্তক্ষেপই সাম্প্রদায়িকতা। শ্রীদাশগুপ্ত আরও বলেন, সংক্ষেপে ধর্মনিরপেক্ষতা হল ধর্ম থেকে রাজনীতি ও শিক্ষার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতার মানে হল ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় কার্যকলাপের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল ও গ্রুপ গঠন করা। ধর্মের ভিত্তিতে কিংবা ধর্মকে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুনাফা লাভের জন্য যেসব দল গড়ে ওঠে সেগুলিকে সাম্প্রদায়িক দল বলা হয়। শিবসেনা, মুসলিম লিগ, ইত্তেহাদুল মুসলিমেন প্রভৃতি দল সাম্প্রদায়িক দল। এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের কাজে আত্মনিয়োগ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে।

সাম্প্রদায়িকতার বহি:প্রকাশ আমরা দেখতে পাই অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস, গোঁড়ামি ও বিদ্বেষ থেকে উদ্ভূত কোনো বিরোধ ও বিতর্ক যখন দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসা, হানাহানি, দাঙ্গা ও খুনের ঘটনার মধ্য দিয়ে ফেটে পড়ে। এই বিরোধ, বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতার মূল নিহিত থাকে সমাজব্যবস্থার মধ্যেই। বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতি এবং তার থেকে উদ্ভূত আর্থসামাজিক পরিস্থিতিই সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভবের মূল কারণ।

প্রকৃতি (Nature) :

সাম্প্রদায়িকতা হল এরকম একটা অন্ধবিশ্বাস যে একটি নির্দিষ্ট ধর্ম অনুসরণ করে এমন একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সকলেরই একই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ থাকে। সাম্প্রদায়িকতা এরকম একটা বিশ্বাসের জন্ম দেয় যাতে মনে করা হয় ভারতে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান ও শিখ প্রত্যেকটিই সম্পূর্ণ পৃথক ; এরা পৃথকভাবে গঠিত ও পৃথকভাবে সংহত। সাম্প্রদায়িক নেতারা তাদের অনুসরণকারীদের মনে এরকম একটা বিশ্বাস জাগায় যে তারা সকলে কেবল যে একই ধর্মীয় নিয়মবিধি মেনে চলে তা নয়, তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থও এক। অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করাতে চায় একজন মানুষের পরিচয় হবে সম্পূর্ণ ধর্মভিত্তিক। ধর্মই হবেই তাদের সামাজিক পরিচয়ের মূল ভিত্তি। ঐতিহাসিক **বিপান চন্দ্র**-এর মতে, সাম্প্রদায়িকতা একটি ভ্রান্ত চেতনা (false consciousness) যা সমাজের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মৌলিক ভিত্তিরূপে ধর্মীয় পার্থক্যসমূহকে গুরুত্ব দেয়।

সাম্প্রদায়িকতা শুধু একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে বলেই যে সেটা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, জঘন্য দৃষ্টিভঙ্গি তা নয়, তারা তাদের নিজেদের সমগ্র সম্প্রদায়েরও প্রতিনিধিত্ব করে না। **বিপান চন্দ্রের** মতে, সাম্প্রদায়িকরা শুধু যে জাতীয় স্বার্থ দেখতে অপারগ তাই নয়—তারা তাদের সমগ্র সম্প্রদায়ের স্বার্থও দেখতে পারে না। কারণ শ্রেণিবিভক্ত সমাজে হিন্দু, মুসলিম বা যে-কোনো সম্প্রদায়ই হোক না কেন, সেই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষরাও শোষক ও শোষিত শ্রেণিতে বিভক্ত এবং তাদের স্বার্থও ভিন্ন। একজন কোটিপতি হিন্দুর বা মুসলিমের স্বার্থ একজন খেতমজুর হিন্দু বা মুসলিমের থেকে স্বতন্ত্র। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতাবাদ কখনোই সমগ্র হিন্দুর বা সমস্ত মুসলমানের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে না। তাই বলা যায়, সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে হয় সচেতন প্রবঞ্চনা বা অচেতন আত্মপ্রবঞ্চনা লুকিয়ে থাকে। সাম্প্রদায়িকরা হয় অপরকে প্রবঞ্চনা করে অথবা সে নিজেকেই প্রবঞ্চনা করে। কারণ সে যে স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি করে, বাস্তবক্ষেত্রে সেরকম সমস্বার্থের কোনো অস্তিত্ব নেই।

মানব সমাজের জন্মলগ্ন বা তার কিছু পর থেকেই ধর্মের উদ্ভব। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রাচীন নয়, এটা একটা আধুনিক ধারণা। ভারতবর্ষে যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ লক্ষ করা যায়, তার উদ্ভব আধুনিক কালেই, ব্রিটিশ আমলে। ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে শিবাজীর যখন লড়াই হয়েছে, তখন সাধারণ হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়নি। **বিপান চন্দ্র**-এর মতে, সাম্প্রদায়িকতা জনসাধারণের রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের জন্য

Scanned by CamScanner

অতীতের প্রতিষ্ঠান, মতাদর্শ ও ঐতিহ্যকে ব্যবহার করলেও এটি একটি **আধুনিক মতাদর্শ**। কারণ প্রকৃতপক্ষে ওইসব অতীত তত্ত্ব, ধ্যানধারণা ও বিশ্বাস ব্যবহৃত হয় আধুনিক পুঁজিবাদের স্বার্থে। বিপান চন্দ্রের মতে, সাম্প্রদায়িকতাকে **ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদ** (religious revivalism) হিসাবে গণ্য করাও ভুল, কারণ এই মতবাদে ধর্মীয় ও কুসংস্কারবাদী ধ্যানধারণাসমূহকে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

বররুদ্দিন উমর তাঁর 'সাম্প্রদায়িকতা' নামক রচনায় মন্তব্য করেছেন যে, **সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিষ্ঠা এক জিনিস নয়**। ধর্মীয় তত্ত্ব ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি নিষ্ঠা থাকলে তাকে বলা হয় ধর্মনিষ্ঠা। অপরপক্ষে সাম্প্রদায়িকতা হল ব্যক্তির সেই মনোভাব যা অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচরণ ও ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করে। ধর্মনিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মীয় আচার-আচরণের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে। পক্ষান্তরে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে নিজের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ এক ধরনের আনুগত্য লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া ধর্মনিষ্ঠা পরকালমুখী, আর সাম্প্রদায়িকতা ইহকালমুখী। একজন ধর্মনিষ্ঠ মানুষ পরকালে সুখভোগের আশায় ধর্মাচরণে রত থাকে। অপরপক্ষে, সাম্প্রদায়িকতার লক্ষ্য ইহলোকেই মুনাফা অর্জন করা। সবশেষে, ধর্মনিষ্ঠার জন্য অন্যের ক্ষতিসাধন করার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বৈশিষ্ট্যই হল অন্যের বিরুদ্ধাচরণ ও ক্ষতিসাধন।

সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে ধর্মীয় মৌলবাদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। এই মৌলবাদের প্রভাবেই সাম্প্রদায়িক দল, গোষ্ঠী ও তাদের নেতৃবৃন্দ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে এবং পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে। ফলত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসাত্মক ঘটনা, খুন, দাঙ্গা, লুঠপাট, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি ঘটতে থাকে এবং সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত হয়।

প্রমোদ কুমার-এর মতে, সাম্প্রদায়িকতা একটি বিকৃত মতাদর্শ, কারণ তা বাস্তবতাকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে না, বরং বিকৃতভাবে উপস্থাপিত করে। নাৎসিবাদ, ফ্যাসিবাদ, জাতিবাদ (racialism) ইত্যাদির মতো সাম্প্রদায়িকতাবাদও সমাজের প্রকৃত সমস্যা ও দ্বন্দ্বগুলিকে আড়াল করে রাখে। উদাহরণস্বরূপ, একটি সাম্প্রদায়িক দল বা গোষ্ঠী সমাজের সমস্ত বেকারদের জন্য চাকরির দাবি করে না, দাবি করে শুধু নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত বেকারদের জন্য।

সবশেষে মনে রাখতে হবে সাম্প্রদায়িকতা থেকে উদ্ভূত হিংসা, দ্বেষ, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের সমগ্র অংশের লাভ হয় না, লাভ হয় কতিপয় চতুর বিত্তবান ও প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তির। সাম্প্রদায়িকতার ভিত যেহেতু সমাজব্যবস্থার মধ্যে নিহিত, সেহেতু একে নির্মূল করতে হলে সমগ্র সমাজব্যবস্থাকেই পাল্টানো দরকার।

১৪.৭ ভারতে সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য
The Nature and Characteristics of Communalism in India

ভারতে অতি প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় বসবাস করে আসছে। এই সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মাঝেমধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামাও ঘটে থাকে। যেমন—কানপুর ও অমৃতসরে শিখ ও নিরঙ্কারীদের মধ্যে, লক্ষ্ণৌতে সিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে, ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে আদিবাসী ও অ-আদিবাসীদের মধ্যে, সিকিমে লেপচা ও ভুটিয়াদের মধ্যে বহুবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা সংঘর্ষ ঘটেছে। কিন্তু এইসব দাঙ্গা ভারতীয় রাজনীতি তথা সমাজব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি বা বড়ো রকমের কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। যে সাম্প্রদায়িক রেষারেষি ও দাঙ্গাহাঙ্গামা ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে এবং দীর্ঘকাল ধরে লালিত ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের ওপর আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছে সেটি হল হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও বিদ্বেষ। প্রকৃতপক্ষে ভারতে সাম্প্রদায়িকতা বলতে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও সংঘর্ষকেই বোঝানো হয়।

ভারতে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে পাশাপাশি বসবাস করে আসছে এবং উভয় সম্প্রদায়ের মিলিত সৃষ্টি রূপায়িত হয়েছে স্থাপত্য (কুতুব মিনার, তাজমহল ইত্যাদি), সঙ্গীত ও সাহিত্যে। মির্জা গালিব, আমির খুশরু, তানসেন ভারতের নিজস্ব হয়ে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

Scanned by CamScanner

কিন্তু ব্রিটিশরা ভারতে আসার পর থেকে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ক্রমশই নষ্ট হতে থাকে এবং এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে রেষারেষি ও সংঘর্ষ একটা স্থায়ী রূপ পেতে থাকে। উনিশ শতকের শেষদিকে ভারতে উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণির নেতৃত্বে যে জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তাকে ঠেকাবার জন্য সুচতুর ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী সাম্প্রদায়িকতাকে হাতিয়ার হিসাবে বেছে নেয়। তারা মিথ্যা প্রচার চালিয়ে, ইতিহাসকে বিকৃত করে, 'বিভক্ত করে শাসন করো' নীতির প্রয়োগ ঘটিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি নাশের চেষ্টা করে এবং অনেকটা সফল হয়। ১৯০৬ সালে ব্রিটিশদের প্ররোচনায় মুসলমানদের জন্য পৃথক প্রতিনিধিত্বের দাবি উত্থাপন করা হয় এবং ঢাকায় 'সারা ভারত মুসলিম লিগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। পরের বছর অর্থাৎ ১৯০৭ সালে পাঞ্জাবে 'হিন্দুসভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে এই হিন্দুসভাই হিন্দু মহাসভায় রূপান্তরিত হয়। গত শতকের বিশের দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক রেষারেষি থাকলেও তা খুব একটা বড়ো আকার ধারণ করেনি। উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনে যোগদান করেছিল। ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ার পর থেকেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রেষারেষি ও সংঘর্ষ চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। ১৯২২ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে সারা ভারতে ১১২টি বড়ো রকমের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ শাসক মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে কখনও উসকানি দিয়েছে, কখনও আইনকানুন প্রণয়নের মাধ্যমে পরিপোষণ করেছে।

পরাধীন ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি নাশের ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের জাতীয় নেতৃবৃন্দের ভূমিকাও কম ছিল না। জিন্না, সাভারকার, গোলওয়লকর প্রমুখ নেতৃবৃন্দের কঠোর সাম্প্রদায়িক মনোভাব শেষ পর্যন্ত ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে ছাড়ে। এ ছাড়া সাম্প্রদায়িক অনৈক্য সৃষ্টিতে লাল-বাল-পাল প্রমুখ 'চরমপন্থী' নেতৃবৃন্দের অবদানও কম ছিল না।

ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর ১০-১২ বছর মোটামুটি শান্তিতেই কেটেছে। দু-একটি ছোটো-খাটো ও বিক্ষিপ্ত ঘটনা বাদ দিলে ওই সময় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনা তেমন একটা ঘটেনি। কিন্তু ১৯৬০-এর দশকের শুরু থেকে পুনরায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও রেষারেষি মাথাচাড়া দিতে থাকে। ১৯৬১ সালে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর এবং উত্তর প্রদেশের আলিগড়ে, ১৯৬৪ সালে মধ্যপ্রদেশ সহ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ব্যাপক আকার ধারণ করে। ক্রমশ এই ধরনের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ভারতের অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ এই দশ বছরে সহস্রাধিক সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ঘটনা ঘটেছে। ১৯৭০-এর দশকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনা অনেকটা কমে যায়। কিন্তু আশির দশক থেকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ পুনরায় মাথাচাড়া দেয় এবং ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। ওই সময় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সংকীর্ণ মতাদর্শগত বিশ্বাসের ভিত্তিতে বেশ কয়েকটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন গড়ে ওঠে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বি.জে.পি., আর. এস. এস., বজরং দল (সংক্ষেপে যাদের সঙ্ঘপরিবার বলা হয়) প্রভৃতি সংগঠনগুলি মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বললেও কার্যত ভারতকে একটি হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর পক্ষপাতী। তারা 'হিন্দুত্ব', 'হিন্দু রাষ্ট্র' প্রভৃতি স্লোগান তুলে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে কোণঠাসা করতে উদ্যত হয়। সংঘপরিবারের অন্যতম তাত্ত্বিক **ড. মুরলী মনোহর যোশীর** মতে, 'হিন্দুত্ব' মোটেই সাম্প্রদায়িক ধারণা নয়। হিন্দুত্ব হল একটি জীবনধারা। অপর এক তাত্ত্বিক **বালাসাহেব দেওরস** বলেছেন, এই দেশকে যারা মাতৃভূমি, হিন্দুভূমি ও পুণ্যভূমি বলে মনে করে এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে হিন্দু সমাজের একাত্মতা স্থাপন করে, তারাই হল হিন্দু। এঁরা মুসলমান ও খ্রিস্টানদের হিন্দু বলে মনে করেন না, কারণ তাঁরা ভারতকে মাতৃভূমি বলে মনে করলেও পুণ্যভূমি বলে মনে করেন না। এইভাবে তাঁরা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলেন। এ ছাড়া 'রামমন্দির নির্মাণ', 'রথযাত্রা', 'একাত্মতা যাত্রা' প্রভৃতি কর্মসূচি গ্রহণ করে সংঘপরিবার ভারতীয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে দুর্যোগময় করে তোলে। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর রামমন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ চূড়ান্ত আকার ধারণ করে এবং দেশের বিভিন্ন অংশে দাঙ্গা বেধে যায়।

ভারতে সাম্প্রদায়িক রেষারেষি ও সংঘর্ষের ব্যাপারে **মুসলিম মৌলবাদও** কম দায়ী নয়। হিন্দু মৌলবাদী সংগঠনগুলির পাশাপাশি ভারতে বেশ কিছু মুসলিম মৌলবাদী সংগঠন গড়ে ওঠে এবং সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও

Scanned by CamScanner

রেষারেষিতে ইন্ধন জোগায়। জামাত-ই-ইসলামি, ইনসাফ পার্টি, ইত্তেহাদুল মুসলিমেন, কাশ্মীর বাবরি অ্যাকশন কমিটি, প্রভৃতি সংগঠনগুলি এবং মুসলিম লিগ-এর মতো রাজনৈতিক দল 'ইসলাম বিপন্ন' আওয়াজ তুলে মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে মদত দিতে থাকে এবং ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে বিষাক্ত করে দিতে থাকে। এইসব মৌলবাদী সংগঠন ও রাজনৈতিক দল নানাপ্রকার প্ররোচনামূলক স্লোগানের মাধ্যমে ভারত সম্পর্কে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটা বিদ্বেষভাব জাগিয়ে তুলতে থাকে। সুদীর্ঘকাল ধরে ভারতে বসবাস করছে এবং ভারতের জল-হাওয়ায় পুষ্ট হয়ে আসছে যে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, তাদেরকে শেখানো হচ্ছে ভারত হল 'শত্রুর দেশ' ('দার উল-হাট')।

এইভাবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলি ভারতের মিশ্র সংস্কৃতি এবং ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেছে এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি করছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কী হিন্দুধর্ম, কী মুসলমান ধর্ম সকল ধর্মেরই সারকথা হল মানবকল্যাণ। কোনো ধর্মই অন্য ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু ও বিদ্বেষভাব পোষণের কথা বলে না। সুতরাং যখন কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় পরধর্ম বিনাশের কথা বলে, তখন তা প্রকৃতপক্ষে নিজধর্মেরই বিরোধিতা করে। ধর্ম মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়, ঘৃণা করতে নয় ; কল্যাণ করতে শেখায়, অনিষ্ট করতে নয়।

১৪.৮ ভারতে সাম্প্রদায়িকতা উন্মেষের কারণসমূহ
The Causes of the Emergence of Communalism in India

ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হয়। কেউ ইংরেজদের বিভেদ নীতিকে, কেউ ভারতীয় শাসকশ্রেণির শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গি ও আপস নীতিকে, কেউ আবার অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে বিতর্ককে, কেউ হিন্দু মৌলবাদকে, কেউ মুসলিম মৌলবাদকে এ ব্যাপারে দায়ী করেছেন। সাম্প্রদায়িকতা মূলত ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপার। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, ভারতে যত সাম্প্রদায়িক গোলযোগ হয়েছে তার খুব অল্পসংখ্যকই মতাদর্শগত বিরোধের জন্য ঘটেছে —("Rarely have ideological differences led to communal troubles."—*'Communalism in India'* by *A. Engineer and M. Shakir*)। সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভবের মূল কারণগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে :

(১) **শাসকশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি :** আমাদের দেশের রাজনৈতিক কাঠামোয়, প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতা যে শিকড় গাড়তে পেরেছে তার জন্য আমাদের শাসকশ্রেণি ও শাসকদলের শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গি ও আপস নীতিকে দায়ী করা হয়। হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি তো আছেই, তা ছাড়াও বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণির বিভিন্ন দল নির্বাচনি লড়াইয়ে ও অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিরোধ করার পরিবর্তে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে আপস করে চলেছে। ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের ভোট পাওয়ার জন্য কংগ্রেস দল একদা ওই সম্প্রদায়কে তোষণ করেছে। আবার ১৯৯১ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস হিন্দু-তোষণ নীতি অবলম্বন করে।

(২) **ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি :** ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রাজনীতিকে ধর্ম থেকে আলাদা রাখার পরিবর্তে ধর্মকে নিয়েই রাজনীতি করেছে। রাজনৈতিক নেতাদের আচরণে সংকীর্ণ ধর্মবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। দেশ যখন সাম্প্রদায়িক দাবানলে উত্তপ্ত, তখন রাজনৈতিক নেতাদের সংকীর্ণ রাজনীতির স্বার্থে ইমাম, শঙ্করাচার্য, মোহান্তদের দ্বারস্থ হতে দেখা যায়। মুসলিম মৌলবাদকে সন্তুষ্ট করার জন্য ঐতিহাসিক শাহ্‌বানু মামলার রায়কে অতিক্রম করে মুসলিম শরিয়তি আইন পাশ করা হয়েছে। আবার হিন্দু মৌলবাদকে তুষ্ট করার জন্য অযোধ্যায় রাম মন্দিরের শিলান্যাস করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, ভারতীয় নেতৃবৃন্দের এহেন আচরণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিপন্থী।

(৩) **মুসলিম অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা :** ভারতে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার অন্যতম উৎস হল মুসলমানদের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা। ব্রিটিশ আমল থেকেই ভারতবর্ষে মুসলমানরা অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় পিছিয়ে থেকেছে। এতে মুসলিমদের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মনে এই ধারণা গড়ে উঠেছে যে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সকল সুযোগসুবিধা ভোগ করছে, কিন্তু মুসলমানরা চাকুরি, শিক্ষা এবং

Scanned by CamScanner

অন্যান্য সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত। মুসলমানদের জন্য কোনোরূপ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। এর ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যের ধারণা গড়ে উঠেছে।

(৪) **সাম্প্রদায়িক দল ও সংগঠন** : ভারতে মুসলিম লিগ, হিন্দু মহাসভা, শিবসেনা, অকালি দল প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলি এবং জামাতে-ই-ইসলাম, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্ট, মজলিস-ই-মুসলমান প্রভৃতি সংগঠনগুলি নিজেদের বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলে জাহির করে, সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেয় এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টিতে প্ররোচনা দেয়।

(৫) **সাম্প্রদায়িক সংবাদপত্র, সাহিত্য ও পাঠ্যপুস্তক** : ভারতবর্ষে এমন অনেক সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি রয়েছে যেগুলি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিনাশের পথকে প্রশস্ত করে। উদাহরণস্বরূপ অর্গানাইজার, স্বস্তিকা, অকালি পত্রিকা, সোবাত, সারসিক প্রভৃতি সংবাদপত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। এইসব সংবাদপত্র ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রে দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সংবাদকে অতিরঞ্জিত করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশকে ধ্বংস করে।

(৬) **ইতিহাসের বিকৃতি** : ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোকে আঘাত করতে এবং সাম্প্রদায়িকতায় ইন্ধন জোগাতে সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট বিকৃত মিথ্যা ইতিহাসের ভূমিকাও কম নয়। ব্রিটিশরা তাদের **বিভেদ নীতির** (Divide and Rule Policy) অন্যতম কৌশল হিসাবে ইতিহাসকে বিকৃত করার কাজটি বেছে নেয়। ব্রিটিশ-আশ্রিত ইতিহাস চর্চার মূল অবদান হল ভারতের ইতিহাসকে তিনটি ভাগে ভাগ করা—(১) প্রাচীন বা হিন্দু যুগ, (২) মধ্য বা মুসলমান যুগ এবং (৩) আধুনিক বা ব্রিটিশ যুগ। আমাদের শেখানো হল মুসলমান যুগে শাসকবর্গ সবই ছিল মুসলমান এবং শাসিত সকল শ্রেণিই ছিল হিন্দু। অথচ সাম্প্রতিককালের গবেষণা থেকে জানতে পারা যায় যে শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায়, জমিদারও ছিল। "ব্রিটিশরা আমাদের ইতিহাস বিকৃত করে দেখাল : হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ চিরন্তন, মুসলমানরা এদেশ আক্রমণ করে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে, মন্দির ভেঙে মসজিদ বানিয়েছে। এই অর্ধসত্য ও মিথ্যা প্রচারে সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকরা প্রকৃত সত্য অনুচ্চারিত রেখে দেয়। হিন্দু-মুসলমানদের মিলিত সৃষ্টি রূপায়িত হয়েছে স্থাপত্য (কুতুব মিনার, তাজমহল ইত্যাদি), সংগীত ও সাহিত্যে। মির্জা গালিব, আমির খুশরু, তানসেন ভারতের নিজস্ব হয়ে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন—এ সত্য ইংরেজরা চেপে রেখেছে।" (রণেন সেন—'সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত)।

কর্নেল মাইলস নামক এক ব্রিটিশ সেনাপতির অসত্য ও অভিসন্ধিমূলক বিবরণের ওপর ভিত্তি করে মহামহোপাধ্যায় **হরপ্রসাদ শাস্ত্রী** লেখেন—টিপু সুলতান তিন হাজার ব্রাহ্মণকে ইসলামে দীক্ষিত করার চেষ্টা করলে তাঁরা আত্মহত্যা করেন। শাস্ত্রী মহাশয় কিন্তু চেপে যান যে, টিপুর বার্ষিক অনুদানেই তাঁর রাজ্যের ১৫৬টি হিন্দু মন্দির প্রতিপালিত হত, শ্রীরঙ্গপত্তম দুর্গে রঙ্গনাথজিকে দর্শন না করে টিপু কোনোদিন প্রাতরাশে বসেননি। এটাও চেপে যান যে, টিপুর প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি ছিলেন হিন্দু। অনুরূপ ঘটনা কিছুটা ঔরঙ্গজেব সম্পর্কেও খাটে।

(৭) **হিন্দু মৌলবাদ** : ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ সৃষ্টির পিছনে হিন্দু মৌলবাদ অনেকাংশে দায়ী। হিন্দু মৌলবাদীদের দাবি হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। তাঁরা মুসলমানদের 'বিদেশি' বলে আখ্যায়িত করছেন। এদেশের ধর্মান্তরিত মুসলমানরা ছাড়া বাদবাকি সব মুসলমানই যে এদেশে বিদেশি একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হল, দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করা মুসলমানরা যদি এদেশে বিদেশি হন, তাহলে আজ যাঁরা নিজেদের নিখাদ হিন্দু বলে দাবি করছেন, তাঁরাও কি অনেকে বিদেশির পর্যায়ে পড়ে যাবেন না ? বস্তুতপক্ষে সেই বিচারে এদেশের আদিবাসীরা ছাড়া বাদবাকি সকলেই (আর্য, রাজপুত, জাঠ ইত্যাদি) হয়তো বিদেশি হয়ে পড়বেন।

(৮) **মুসলিম মৌলবাদ** : ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টির ব্যাপারে মুসলমান মৌলবাদীদের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব অনেকখানি দায়ী সেকথা অস্বীকার করা যায় না। দীর্ঘকাল যাবৎ এদেশে বসবাস করেও তাঁরা অনেকে ভারতকে নিজের দেশ বলে ভাবতে পারেন না। শোনা যায়, ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানেরা ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। রামায়ণ-মহাভারতের গল্প সেখানে ভীষণ জনপ্রিয়, প্রাচীন ভারতীয় নাম (সুকর্ণ, সুহার্ত) তাঁদের ভীষণ পছন্দ; কিন্তু ভারতে কাজী নজরুল ইসলাম যখন তাঁর

Scanned by CamScanner

সন্তানদের নাম রাখেন সব্যসাচী, অনিরুদ্ধ ইত্যাদি, তখন তাঁকে ভারতীয় মুসলমানদের অনেকে 'কাফের' বলেন। আজও ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান ক্রিকেটে জিতলে ভারতের বহু মুসলমান আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন, বাজি ফাটান, মিষ্টান্ন বিতরণ করেন। মুসলিম লিগের আক্রমণের লক্ষ্য যত না ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল 'কংগ্রেস পার্টির হিন্দু নেতৃত্বের' বিরুদ্ধে।

(৮) **মনস্তাত্ত্বিক (Psychological) কারণ :** সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষে মনস্তাত্ত্বিক উপাদান একটা বড়ো ভূমিকা পালন করে। হিন্দুরা মনে করে মুসলমানরা ভীষণ ধর্মীয় আবেগসম্পন্ন এবং মৌলবাদী। হিন্দুদের আরও বিশ্বাস, মুসলমানরা হল ভারত বিরোধী, তাদের মধ্যে দেশপ্রেম বলে কিছু নেই। অপরদিকে মুসলিমরা ভাবে তারা ভারতে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরকি হিসাবে গণ্য হয় এবং তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণকে হিন্দুরা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে।

(১০) **শত্রু দেশের উস্কানি (Provocation) :** কিছু বিদেশি রাষ্ট্র তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ভারতের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষভাব সৃষ্টি করে এবং সাম্পদায়িক সম্প্রীতিনাশের চেষ্টা করে যায়। ভারতের উগ্র মুসলিম সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলিকে পাকিস্তান নানাভাবে সাহায্য দেয় এবং ভারতের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা (riot) বাধানোর ব্যাপারে প্ররোচিত করে। পাকিস্তান ভারতের অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সংহতিকে নষ্ট করতে কাশ্মীরের যুবসম্প্রদায়কে রীতিমতো প্রশিক্ষণ দেয়।

(১১) **গণমাধ্যমগুলির নেতিবাচক ভূমিকা :** সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বাড়ানোর ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির গণমাধ্যমগুলির ভূমিকাও কম নয়। তারা অনেক সময় তিলকে তাল করে। দেশের মধ্যে ছোটোখাটো সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বা সংঘর্ষ বাধলে সেগুলিকে গণমাধ্যমগুলি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বিরাট করে দেখায়। তাতে অহেতুক উত্তেজনা ছড়ায়।

১৪.৯ ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে পার্থক্য
Distinction between Secularism and Communalism

অথবা, সাম্প্রদায়িকতা কি ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা ধারণার পরিপন্থী ?
Is Communalism Opposed to Indian Secularism ?

পশ্চিমি ধারণার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল না থাকলেও ভারত যে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ তা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। সুদীর্ঘকাল থেকে ভারত ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে অনুসরণ করে আসছে। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাতেও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শটি স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ ভারতে বসবাস করছে এবং নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে আসছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার ধারণাটি ভারতের সেই আজন্ম লালিত ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে এবং এখনও করছে। কোন্ কোন্ দিক থেকে সাম্প্রদায়িকতার ধারণাটি ভারতে সনাতন ধর্মনিরপেক্ষ ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তা নিয়ে আলোচনা করা হল ।

(১) ধর্মনিরপেক্ষতা হল এমন কিছু যার সঙ্গে ধর্ম বা ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। অপরপক্ষে সাম্প্রদায়িকতা বলতে কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি গভীর প্রত্যয় বা অনুরাগকে বোঝায়।

(২) ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে আদর্শগত দিক থেকেও পার্থক্য রয়েছে। **ধর্মনিরপেক্ষতা বস্তুবাদ, মানবিকতাবাদ, যুক্তিবাদ প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।** এটি হল এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি যা ঈশ্বরের পরিবর্তে মানুষকে যাবতীয় জাগতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করে। ধর্মনিরপেক্ষতা মনে করে সমাজের নীতিবোধ তৈরি হবে মানুষের ইহজগতের ভালোমন্দের বিচারে, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। **অপরপক্ষে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে ধর্মের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ লক্ষ করা যায়।** সাম্প্রদায়িক নেতাদের কাছে মানুষের পরিচয় তার কর্ম বা গুণ নয়, তার ধর্ম। তাঁরা মনে করেন, একজন মানুষের পরিচয় হবে ধর্মকে ভিত্তি করে ; ধর্মই হবে মানুষের সামাজিক পরিচয়ের মূল ভিত্তি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, **একজন ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ আস্তিক হতে পারে অথবা নাস্তিক হতে পারে, কিন্তু একজন সাম্প্রদায়িক মানুষ নাস্তিক হয় না।**

Scanned by CamScanner

(৩) ধর্মনিরপেক্ষতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল **ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে পৃথকীকরণ**। ধর্মনিরপেক্ষতা হল এই ধরনের একটা বিশ্বাস যে রাজনীতি, নৈতিকতা, শিক্ষা ইত্যাদি ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র থাকবে। **পক্ষান্তরে সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ** যোগাযোগ থাকে। রাজনীতিতে, প্রশাসন ব্যবস্থায় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মের হস্তক্ষেপই হল সাম্প্রদায়িকতা। **সুধাংশু দাস-এর মতে,** সাম্প্রদায়িকতা মানে হল ধর্ম ও রাজনীতিকে মিশিয়ে ফেলা ; শিক্ষা, প্রশাসন ও রাজনীতিতে কোনো একটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় চিন্তাধারাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং সেই ধর্মীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনা করা। শ্রী দাশগুপ্ত আরও বলেন, "সংক্ষেপে ধর্মনিরপেক্ষতা হল ধর্ম থেকে রাজনীতি ও শিক্ষার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতার মানে হল ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় কার্যকলাপের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল ও গ্রুপ গঠন করা। ধর্মের ভিত্তিতে অথবা ধর্মকে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুনাফা লাভের জন্য যেসব দল গড়ে ওঠে সেগুলিকে সাম্প্রদায়িক দল বলা হয়। শিবসেনা, মুসলিম লিগ, ইত্তেহাদুল মুসলিমেন প্রভৃতি দলগুলি সাম্প্রদায়িক দল। এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের কাজে আত্মনিয়োগ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে।"

(৪) **ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সকল ধর্মকে সমান দৃষ্টিতে দেখা এবং কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করা।** ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার আদর্শটি গুরুত্ব পায়। **পক্ষান্তরে, এক ধর্মীয় সম্প্রদায় কর্তৃক অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব পোষণ ও ঘৃণা ছড়ানোই হল সাম্প্রদায়িকতা।** সাম্প্রদায়িকতা হল এমন একটা মতাদর্শ যা অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে নিজের ধর্মীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষতা যেখানে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে চায়, সাম্প্রদায়িকতা সেখানে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও সংঘাত সৃষ্টি করতে চায়।

(৫) **সময়ের বিচারেও ধর্মনিরপেক্ষ ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়।** ধর্মনিরপেক্ষতা হল অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ধারণা। ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ অনুসরণ করা হচ্ছে বহু প্রাচীনকাল থেকেই। ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে শিবাজির যখন লড়াই হয়েছে, তখনও সাধারণ হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়নি। অপরপক্ষে সাম্প্রদায়িকতা হল একটি আধুনিক ধারণা। ভারতবর্ষে যে সাম্প্রদায়িকতা লক্ষ করা যায়, তার উদ্ভব আধুনিক কালেই, ব্রিটিশ আমলে। **বিপান চন্দ্র**-এর মতে, সাম্প্রদায়িকতা জনসাধারণের রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের জন্য অতীতের প্রতিষ্ঠান, মতাদর্শ ও ঐতিহ্যকে ব্যবহার করলেও এটি একটি আধুনিক মতাদর্শ। কারণ, প্রকৃতপক্ষে ওইসব অতীত তত্ত্ব, ধ্যানধারণা ও বিশ্বাস ব্যবহৃত হয় আধুনিক পুঁজিবাদের স্বার্থে।

(৬) ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি হল বস্তুবাদ, মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, বহুত্ববাদ, পরধর্ম সহিষ্ণুতা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি হল মৌলবাদ, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, গোঁড়ামি, হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, সংকীর্ণতা, ভণ্ডামি, মিথ্যাচার ইত্যাদি।

(৭) **ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারীরা চান ধর্ম বা সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণ ও বিকাশ।** তাঁরা বিশ্বাস করেন, সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উন্নতি ও বিকাশের মধ্যে নিহিত থাকে সমাজের সামগ্রিক উন্নতি। **অপরপক্ষে, সাম্প্রদায়িকতার অনুসরণকারীদের বিশ্বাস, অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়কে আঘাত বা ক্ষতিগ্রস্ত না করে নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতি সম্ভব নয়।** এর অনিবার্য পরিণতি হল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে রেষারেষি, সংঘর্ষ, যা শেষ পর্যন্ত দেশের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং উন্নয়ন ব্যাহত করে।

(৮) **মানবজাতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।** ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে সকল ধর্মের মানুষের কল্যাণ কামনা করা হয় এবং সকল মানুষকে সমান চোখে দেখা হয়। পক্ষান্তরে সাম্প্রদায়িক নেতারা কেবল নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদেরই আপন বলে ভাবতে পারেন; তার বাইরে সমস্ত মানুষের প্রতিই তাঁরা বিদ্বেষভাব পোষণ করেন। কাশ্মীরের উগ্রপন্থী মুসলমানরা বা হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতারা জনগণ বলতে কেবল নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদেরই বোঝেন এবং তাদের স্বার্থের কথাই ভাবেন।

Scanned by CamScanner

(৯) **পরিশেষে, ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে কোনোরূপ ভণ্ডামি বা চাতুরি বা সংকীর্ণতা থাকে না। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে ভণ্ডামি ও সংকীর্ণতা লক্ষ করা যায়।** সাম্প্রদায়িক নেতারা তাঁদের সমর্থকদের মনে এক ধরনের ভ্রান্তচেতনা ও অন্ধবিশ্বাস ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। যে-কোনো সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর নেতারা দাবি করেন যে, তাঁদের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সকলেরই স্বার্থ অভিন্ন এবং তাঁরা সেই সাধারণ স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে চান। বাস্তবে তা হয় না। **বিপান চন্দ্র**-এর মতে, সাম্প্রদায়িকতা কখনোই সমগ্র হিন্দুর বা সমস্ত মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে না। একজন কোটিপতি হিন্দু বা মুসলিমের স্বার্থ একজন খেতমজুর হিন্দু বা মুসলিমের থেকে স্বতন্ত্র। তাই সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে হয় সচেতন প্রবঞ্চনা অথবা অচেতন আত্মপ্রবঞ্চনা লুকিয়ে থাকে। তবে বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের নামেও ভণ্ডামি ও সংকীর্ণ রাজনীতির খেলা চলতে থাকে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষ ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। পৃথিবীকে যদি সুন্দর ও শান্তিময় করে তুলতে হয় তাহলে প্রয়োজন ধর্মনিরপেক্ষতা ; আর যদি রসাতলে পাঠাতে হয় তাহলে দরকার সাম্প্রদায়িকতা।

অনুশীলনী

ক রচনাত্মক প্রশ্নাবলি

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০

১ ধর্মের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।
২ ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করো।
৩ ধর্ম নিরপেক্ষতার অর্থ বিশ্লেষণ করো।
৪ ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো।
৫ ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার সংস্যা ও প্রতিকূলতা আলোচনা করো।
৬ সাম্প্রদায়িকতা কী? এর প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো।
৭ ভারতে সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো।
৮ ভারতে সাম্প্রদায়িকতা উন্মেষের কারণগুলি উল্লেখ করো।
৯ ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

অথবা, সাম্প্রদায়িকতা কি ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা ধারণার বিরোধী?

খ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান ৫

প্রশ্ন ১ ▌ ধর্মের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : ১৪.১-এর আলোচনার দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্যারা দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ৩১৪।

প্রশ্ন ২ ▌ ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।

উত্তর : ১৪.১-এর 'বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ৩১৫।

প্রশ্ন ৩ ▌ সমাজজীবনে ধর্মের ইতিবাচক ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

উত্তর : সমাজজীবনে ধর্ম এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। সমাজজীবনে ধর্মের ইতিবাচক দিকগুলি হল নিম্নরূপ :

(১) ধর্মের অন্যতম প্রধান কাজ হল সামাজিক ঐক্য ও সংহতিকে সুদৃঢ় করে তোলা। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে উৎসবের সময় বহু মানুষ একত্রিত হয় এবং তাদের মধ্যে একটি সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
(২) ধর্ম তথা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষকে সৎ ও বিবেকবান হতে, সামাজিক অনুশাসন মেনে চলতে এবং সামাজিক দায়দায়িত্ব পালন করতে অনুপ্রাণিত করে। ফলে সুশৃঙ্খল ও সুগঠিত সমাজ জীবন সম্ভব হয়।
(৩) ধর্ম মানুষকে নীতিনিষ্ঠ, সহনশীল, পরোপকারী ও সহানুভূতি সম্পন্ন হতে শিক্ষা দেয় এবং মানুষের চরিত্র গঠনে বড়ো রকমের ভূমিকা পালন করে।

Scanned by CamScanner

(৪) সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসাবে ধর্মের ভূমিকা সুবিদিত। ধর্ম কিছু কিছু সামাজিক কাজকর্মকে অনুমোদন করে না এবং কিছু কিছু কাজকর্মকে ঈশ্বর বিরোধী বলে প্রচার করে। ধর্মীয় অনুশাসনের মডেল বা আদর্শ মানুষ ভয়ে অথবা ভক্তিতে মেনে নেয় বলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কাজটি সহজ হয়।

(৫) সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলার বিকাশেও ধর্মের অবদান কম নয়। ঈশ্বরের আরাধনায় নানা ধরনের কালজয়ী সাহিত্য, সংগীত ও চিত্রকলা সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মবোধের প্রেরণায় যেসব মঠ, মন্দির, মসজিদ, গির্জা ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে তার শিল্পকর্ম মানুষকে বিস্মিত করে।

(৬) এ ছাড়া মানুষের হতাশা কাটাতে এবং মনোবল বৃদ্ধিতে ধর্মের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ৪ ▌ ধর্মের নেতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে টীকা লেখো।

উত্তর : ধর্মের নেতিবাচক দিকগুলি হল নিম্নরূপ :

(১) ধর্ম সামাজিক ঐক্যের পরিপন্থী। একই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যেমন গভীর একাত্মবোধ তৈরি হয়, তেমনি এই ধর্মবোধই এক সম্প্রদায়ের মানুষকে অন্য সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরিভাব সৃষ্টি করে। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত রক্তক্ষয়ী বিরোধ, সংঘর্ষ ও দাঙ্গা ঘটেছে তার অধিকাংশই ধর্মকে কেন্দ্র করে।

(২) ধর্মবিশ্বাসীরা যুগের পরিবর্তনকে স্বাগত জানাতে অস্বীকার করে এবং পুরোনো ধ্যানধারণা ও আচার-অনুষ্ঠানকে নতুন পরিস্থিতিতেও অপরিবর্তিত অবস্থায় প্রয়োগ করতে চায়। তাই ধর্ম হল প্রগতি বিরোধী।

(৩) ধর্ম মানুষকে অদৃষ্টবাদী করে তোলে। ধর্ম মানুষের মনে অন্ধবিশ্বাস ঢুকিয়ে দেয় এবং মানুষকে প্রতিবাদবিমুখ, নিস্পৃহ ও নিরুদ্যম করে তোলে।

(৪) মার্কসবাদ অনুসারে ধর্ম হচ্ছে শ্রেণিস্বার্থ ও শ্রেণিশোষণ অব্যাহত রাখার এক কূটকৌশল। ধর্ম শোষণ ভারাক্রান্ত মানুষের কোনো সমস্যাই সমাধান করে না, বরং তাদের ভুল পথে পরিচালিত করে তাদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবনযাত্রাকে আরও অসহনীয় করে তোলে।

(৫) ধর্মবিশ্বাসীরা মনে করেন যে, ধর্মগ্রন্থের মধ্যে যাবতীয় জ্ঞান, সত্য ও দর্শন নিহিত আছে, তার বাইরে জ্ঞানান্বেষণের চেষ্টা অর্থহীন। এই ধরনের বিশ্বাস মানুষের সৃজনশীল কাজে বাধা দেয় এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিরোধিতা করে। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিরোধিতা করায় বহু সমাজসংস্কারক ও বৈজ্ঞানিককে প্রাণ দিতে হয়েছে।

(৬) ধর্মীয় রাষ্ট্রগুলিতে মানুষকে প্রচলিত ধর্মীয় অনুশাসনগুলি মানতে বাধ্য করা হয়। আফগানিস্থানের তালিবান শাসকরা সংকীর্ণ ধর্মীয় বিশ্বাসে প্রভাবিত হয়ে নারী জাতিকে নানারূপ নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছে। 'পবিত্র' কোরানের সঙ্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করায় সলোমন রুশদি, তসলিমা নাসরিন প্রমুখ চিন্তাবিদের বিরুদ্ধে মৃত্যু পরোয়ানা জারি করা হয়।

প্রশ্ন ৫ ▌ ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করো।

উত্তর : ধর্ম ও রাজনীতি—এ দুটি বিষয় একে অপরের থেকে আলাদা। ধর্ম হল আধ্যাত্মিক জগতের বিষয়, আর রাজনীতি হল বাস্তব জগতের বিষয়। প্রথমটি অপার্থিব, দ্বিতীয়টি পার্থিব। এতদ্‌সত্ত্বেও এদুটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত ঐশ্বরিক মতবাদটি ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ওপর জোর দেয়।

প্রাচীনকালে ভারত, মিশর, চিন, জাপান ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে গণ্য করা হত। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার প্রাণকেন্দ্রে ধর্মের বিশিষ্ট স্থান ছিল।

মধ্যযুগেও ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ লক্ষ করা যায়। সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী ইউরোপের বিভিন্ন অংশে চলেছে রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে, রাজা ও পোপের মধ্যে বিরোধ বা সংঘর্ষ। বর্তমান যুগে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আগের তুলনায় অনেকখানি শিথিল হয়েছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার, প্রকৃতির নিয়মের কার্যকারণ সূত্র আবিষ্কার, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের ওপর যুক্তি ও বিজ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি—এসবের যৌথ ফলশ্রুতিতে রাজনৈতিক জীবনে ধর্মের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। আধুনিক যুগে বেশির ভাগ রাষ্ট্রই ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে ধর্মবিরোধী বা অধার্মিক রাষ্ট্রকে বোঝায় না, বোঝায় এমন একটি রাষ্ট্রকে যেখানে সমাজ ও রাজনীতির

Scanned by CamScanner

ওপর থেকে ধর্মের পরম্পরাগত প্রভাবকে দুর্বল করা হয়েছে, যেখানে ঈশ্বরের পরিবর্তে মানুষকে সমস্ত জাগতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়েছে, যেখানে রাজনীতিকে ঈশ্বর ও ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র করা হয়েছে।

তবে এই বর্তমান যুগেও রাজনীতির ওপর থেকে ধর্মের প্রভাব পুরোপুরি অন্তর্হিত হয়নি, বরং কোথাও কোথাও বেড়েছে। সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর সর্বত্র যে সন্ত্রাসবাদ মাথাচাড়া দিয়েছে তার মূলে তো ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার। আজও পৃথিবীতে যত রক্তক্ষয় হচ্ছে, তার অধিকাংশই ধর্মীয় কারণে।

প্রশ্ন ৬ ▌ ভারতীয় রাজনীতিতে ধর্মের ভূমিকা আলোচনা করো।

উত্তর : প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় রাজননীতিতে ধর্মের প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রাচীন ভারতে ধর্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বতন্ত্র বিষয় ছিল না। প্রাচীন হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। হিন্দু পুরাণ অনুসারে বহু রাজারই জন্ম দেবতার অংশ থেকে, কারও উৎপত্তি সূর্য থেকে, কারও বা চন্দ্র থেকে। যুধিষ্ঠিরকে বলা হয় ধর্মপুত্র।

বর্তমান কালে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার, অন্ধবিশ্বাসের স্থানে যুক্তি ও বিজ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি—এসবের ফলে সমাজ ও রাজনীতির ওপর থেকে ধর্মের পরম্পরাগত প্রভাব পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও অনেকাংশে দুর্বল হয়েছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এতসব সত্ত্বেও ভারতে রাজনীতিকে ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র রাখা হয়নি। বরং রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের ঘনিষ্ঠতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। জাতির জনক গান্ধিজি স্বয়ং বলেছেন, রাজনীতি ধর্মহীন হতে পারে না। ধর্মবিবর্জিত রাজনীতিকে তিনি এমন একটি মৃত্যুফাঁদ (death-trap) বলেছেন, যা মানুষের আত্মাকে হত্যা করে।

বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের আচরণেও সংকীর্ণ ধর্মবিশ্বাসকে প্রশ্রয় পেতে দেখা যায়। ধর্মীয় মৌলবাদের তাণ্ডবে দেশ যখন বিপর্যস্ত, তখনও দেখা যায় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী প্রমুখ ভারতের রাজনীতির উচ্চ পদাধিকারী বেশ ঢাকঢোল পিটিয়ে মন্দিরে-মসজিদে ছুটছেন। নির্বাচনের সময় এঁরা নিজ নিজ ধর্মসম্প্রদায়ের কাছে ভোটের জন্য আবেদন রাখছেন। নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে, মন্ত্রিসভা গঠনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিচারবিবেচনাকে প্রাধান্য পেতে দেখা যাচ্ছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে ধর্মসাপেক্ষ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ-বর্জনই এখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রশ্ন ৭ ▌ ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ কী?

উত্তর : ১৪.৩-এর আলোচনার শুরু থেকে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের 'লুথেরা'-র আগে পর্যন্ত দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা ৩১৯।

প্রশ্ন ৮ ▌ ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ সম্পর্কে একটি টীকা লেখো।

উত্তর : সাধারণভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে পৃথকীকরণকে বোঝায়।

এরপর ১৪.৪-এর আলোচনার দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্যারা দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ৩২০-৩২১।

প্রশ্ন ৯ ▌ ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

উত্তর : সাধারণভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে পৃথকীকরণকে বোঝায়। কিন্তু ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ কথাটি একটু ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয়। এখানে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে সকল ধর্মকে সমান মর্যাদা দেওয়াকে বোঝানো হয়। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম রূপকার **আয়েঙ্গার** গণপরিষদে বলেছিলেন, "ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ কথাটির অর্থ হল রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মকে সাহায্য বা পৃষ্ঠপোষকতা করবে না এবং এক ধর্ম অপেক্ষা অন্য ধর্মকে প্রাধান্য দেবে না।"

দ্বিতীয়ত, পশ্চিমি রাষ্ট্রগুলিতে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হল রাষ্ট্রপরিচালনা, শিক্ষানীতি, রাজনীতি, নাগরিক অধিকার ইত্যাদি থেকে ধর্মের পরম্পরাগত প্রভাবকে দুর্বল করা। কিন্তু ভারতবর্ষে ধর্মকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে রাখা হয় না এবং রাজনীতি, শিক্ষা ইত্যাদি থেকে ধর্মকে আলাদা করা হয় না।

তৃতীয়ত, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ধর্মীয় সহনশীলতা। এখানে সর্বধর্ম সমন্বয়কেই ধর্মনিরপেক্ষতা বলে চালাবার চেষ্টা করা হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রায় সকল ভারতীয় রাষ্ট্রদার্শনিকের চিন্তায় ও কর্মে রাজনীতি ও ধর্মের সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। গান্ধিজি, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ

Scanned by CamScanner

দেশনেতা ধর্ম ও রাজনীতিকে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করতেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে এবং স্বাধীন ভারতেও সেই ট্র্যাডিশন অব্যাহত রয়েছে। ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আচরণে সংকীর্ণ ধর্মবিশ্বাসকে প্রশ্রয় পেতে দেখা যায়।

তবে অধ্যাপক **জে. সি. জোহারি** ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার কয়েকটি ইতিবাচক দিকের উল্লেখ করেছেন, যেমন—(ক) ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা তুলনামূলক বিচারে উদার (liberal)। এখানে ধর্ম গ্রহণ, ধর্ম পালন ও ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে ; (খ) এখানকার ধর্মনিরপেক্ষতা স্থাণু বা অচল নয়, পরিবর্তনশীল (dynamic)। (গ) ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা চরম নয়, শর্তসাপেক্ষ।

প্রশ্ন ১০ ▌সাম্প্রদায়িকতা বলতে কী বোঝ?

উত্তর : সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িকতা বলতে কোনো ধর্মমতের প্রতি গভীর প্রত্যয় বা অনুরাগকে বোঝায়। কিন্তু বাস্তবে সাম্প্রদায়িকতা বলতে বোঝায় এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ ও প্ররোচনাদানমূলক কাজ। একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় কর্তৃক অন্য একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ভাব পোষণ এবং তার বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোই হল সাম্প্রদায়িকতা। **ভি. আর. মেহেতা** (V. R. Mehta) তাঁর *'Ideology, Modernisation and Politics in India'* গ্রন্থে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধকে সাম্প্রদায়িকতা বলে উল্লেখ করেছেন। **রবার্ট মেলসন এবং উলপে** (Melson and Wolpe) বলেছেন, কোনো সম্প্রদায়ের নিজ অস্তিত্বকে রাজনৈতিকভাবে জাহির করাই হল সাম্প্রদায়িকতা ("Communalism is the political assertiveness of a community to maintain its identity.....")। সাম্প্রদায়িকতা হল একটা মতাদর্শ যা অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে নিজের ধর্মীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি হল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্যহীন স্বার্থের সংঘাত। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক **বিপান চন্দ্র** তাঁর *Communalism in Modern India* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, সাম্প্রদায়িকতা হল এমন এক বিশ্বাস যে, একটি বিশেষ ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করলে সংশ্লিষ্ট ধর্মভুক্ত মানুষদের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে।

সাম্প্রদায়িকতার বহি:প্রকাশ আমরা দেখতে পাই অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস, গোঁড়ামি ও বিদ্বেষ থেকে উদ্ভূত কোনো বিরোধ ও বিতর্ক যখন দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসা, হানাহানি, দাঙ্গা ও খুনের ঘটনার মধ্য দিয়ে ফেটে পড়ে।

প্রশ্ন ১১ ▌ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষের কারণগুলি ব্যাখ্যা করো।

উত্তর : ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বৃদ্ধিতে যেসব কারণ কার্যকর রয়েছে সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল :

(১) ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি : ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রাজনীতিকে ধর্ম থেকে আলাদা রাখার পরিবর্তে ধর্মকে নিয়েই রাজনীতি করে থাকেন। রাজনৈতিক নেতাদের আচরণে সংকীর্ণ ধর্মবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

(২) ইতিহাসের বিকৃতি : ভারতে সাম্প্রদায়িকতায় ইন্ধন জোগাতে সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট বিকৃত মিথ্যা ইতিহাসের ভূমিকাও কম নয়। ব্রিটিশরা তাদের বিভেদ নীতির (Divide and Rule Policy) অন্যতম কৌশল হিসাবে ইতিহাসকে বিকৃত করার কাজটি বেছে নেয়।

(৩) হিন্দু মৌলবাদ : ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ সৃষ্টির পিছনে হিন্দু মৌলবাদ অনেকাংশে দায়ী। হিন্দু মৌলবাদের দাবি হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। তাঁরা মুসলমানদের বিদেশি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

(৪) মুসলিম মৌলবাদ : ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টির ব্যাপারে মুসলমান মৌলবাদীদের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব অনেকখানি দায়ী। দীর্ঘকাল ধরে এদেশে বাস করেও তাঁরা অনেকে ভারতকে নিজের দেশ বলে ভাবতে পারেন না।

(৫) মুসলিমদের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা : ভারতে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক রেষারেষির অপর একটি কারণ হল মুসলমানদের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা।

(৬) সাম্প্রদায়িক দল ও সংগঠন : ভারতে মুসলিম লিগ, অকালি দল, শিবসেনা, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি রাজনৈতিক দল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, জামাতে-ই-ইসলাম, ইত্তেহাদুল মুসলিমেন প্রভৃতি সংগঠনগুলি নিজেদের বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলে জাহির করে এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টিতে প্ররোচনা দেয়।

Scanned by CamScanner

(৭) সাম্প্রদায়িক সংবাদপত্র, পত্রপত্রিকা ইত্যাদি : ভারতবর্ষে এমন অনেক সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি রয়েছে যেগুলি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিনাশের পথকে প্রশস্ত করে।

প্রশ্ন ১২ ▌ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো।

উত্তর : সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্ম এক জিনিস নয়। মানব সভ্যতার ঊষাকাল থেকে শুরু করে আজ অবধি ধর্ম ব্যক্তিজীবন তথা সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা প্রাচীন নয় ; এটা একটা আধুনিক ধারণা। ভারতবর্ষে যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ লক্ষ করা যায়, তার উদ্ভব আধুনিক কালেই, ব্রিটিশ আমলে। ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে শিবাজির যখন লড়াই হয়েছে, তখন সাধারণ হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়নি। অর্থাৎ তখনও এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক রেষারেষি শুরু হয়নি।

এরপর ১৪.৬-এর আলোচনার শেষের দিকে 'বররুদিন উমর' থেকে 'ক্ষতিসাধন' পর্যন্ত অনুচ্ছেদটি দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ৩২৫।

প্রশ্ন ১৩ ▌ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো।

অথবা, সাম্প্রদায়িকতা কি ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার বিরোধী?

উত্তর : ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে পার্থক্যগুলি হল নিম্নরূপ :

(১) ধর্মনিরপেক্ষ হল এমন কিছু যার সঙ্গে ধর্ম বা ধর্মসম্পর্কিত বিষয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। অপরপক্ষে সাম্প্রদায়িকতা বলতে কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি গভীর প্রত্যয় বা অনুরাগকে বোঝায়। ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি হল বস্তুবাদ, যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, পরধর্ম সহিষ্ণুতা ইত্যাদি ; পক্ষান্তরে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি হল মৌলবাদ, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, হিংসা, মিথ্যাচার ইত্যাদি।

(২) ধর্মনিরপেক্ষতা হল ধর্ম থেকে রাজনীতি ও শিক্ষার পৃথকীকরণ। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতার অর্থ হল ধর্ম ও রাজনীতিকে মিশিয়ে ফেলা ; শিক্ষা, প্রশাসন ও রাজনীতিতে কোনো একটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় চিন্তাধারাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং সেই ধর্মীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনা করা।

(৩) ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল মনুষ্যত্ব, মানবিকতা, যুক্তিবাদ ইত্যাদি। ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ অনুযায়ী মানুষের পরিচয় তার কর্ম বা গুণ, ধর্ম নয়। অপরপক্ষে সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল ধর্ম, কর্ম বা গুণ নয়। সাম্প্রদায়িক নেতারা মনে করেন, ধর্মই হল মানুষের সামাজিক পরিচয়ের মূল ভিত্তি।

(৪) ধর্মনিরপেক্ষতার কাছে আগে মানুষ, পরে ধর্ম বা ঈশ্বর। ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি যাবতীয় জাগতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে ঈশ্বরের পরিবর্তে মানুষকে রাখে। পক্ষান্তরে, সাম্প্রদায়িকতার কাছে ঈশ্বর আগে, মানুষ পরে। একজন ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ আস্তিক অথবা নাস্তিক হতে পারে। কিন্তু একজন সাম্প্রদায়িক মানুষ কখনোই নাস্তিক হয় না।

(৫) ধর্মনিরপেক্ষতার বৈশিষ্ট্য হল সকল ধর্মকে সমান দৃষ্টিতে দেখা এবং কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করা। পক্ষান্তরে, এক ধর্মীয় সম্প্রদায় কর্তৃক অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব পোষণ ও ঘৃণা ছড়ানোই হল সাম্প্রদায়িকতা।

(৬) ধর্মনিরপেক্ষতা যেখানে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে চায়, সাম্প্রদায়িকতা সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও সংঘাত সৃষ্টি করতে চায়।

প্রশ্ন ১৪ ▌ভারতে সাম্প্রদায়িকতার ওপর একটি টীকা লেখো।

উত্তর : ভারতে অতি প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় বসবাস করে আসছে। তাদের মধ্যে মাঝেমধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা সংঘর্ষ ঘটেছে। কিন্তু ওইসব দাঙ্গা ভারতীয় রাজনীতি তথা সমাজব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। কিন্তু আধুনিককালে হিন্দু ও মুসলমান এই দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক রেষারেষি, সংঘর্ষ, দাঙ্গাহাঙ্গামা ভারতীয় রাজনীতির একটা বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।

Scanned by CamScanner

ব্রিটিশরা ভারতে আসার পর থেকে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক রেষারেষি ও সংঘর্ষ একটা স্থায়ী রূপ পেতে থাকে। ব্রিটিশরা মিথ্যা প্রচার চালিয়ে, ইতিহাসকে বিকৃত করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতিনাশের চেষ্টা করেছে।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতিনাশের ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের জাতীয় নেতৃবৃন্দের ভূমিকাও কম ছিল না। জিন্না, সাভারকার, গোলওয়লকর প্রমুখ নেতার কঠোর সাম্প্রদায়িক মনোভাব শেষ পর্যন্ত ভারতকে দ্বিখন্ডিত করে ছাড়ে।

স্বাধীন ভারতে প্রথম তিন দশক তেমন একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটেনি। কিন্তু গত শতকের ৮০-এর দশক থেকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ প্রবলভাবে মাথাচাড়া দেয় এবং ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ চরম আকার ধারণ করে এবং দেশের বিভিন্ন অংশের দাঙ্গা বেধে যায়।

ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষের পিছনে সবচেয়ে বড়ো কারণ উভয় সম্প্রদায়ের মৌলবাদী নেতৃবৃন্দের উসকানি ও প্ররোচনা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বা সংঘর্ষে বহু মানুষের অকালমৃত্যু ঘটে। এ ছাড়া এর মারাত্মক পরিণতি হল দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, উন্নয়ন ব্যাহত হওয়া এবং সুনাম ক্ষুণ্ণ হওয়া।

গ অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান ২

প্রশ্ন ১ ▌ ধর্মের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : শব্দগত অর্থে বলা যায়, যা ধারণ করে বা ধরে রাখে তাই ধর্ম। ওয়েবস্টার-এর অভিধান অনুযায়ী, ধর্ম হল বন্ধন ; ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনে যা যথার্থ সংহতি আনে তাই ধর্ম। সমাজবিদ **ম্যাকাইভার** ধর্মকে এক বিশেষ ধরনের সম্পর্ক বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, ধর্ম একদিকে মানুষের সঙ্গে মানুষের, অন্যদিকে মানুষের সঙ্গে উর্ধ্বশক্তির সম্পর্ক গড়ে তোলে।

প্রশ্ন ২ ▌ ধর্মের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

উত্তর : (ক) ধর্মের ক্ষেত্রে অতিপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস থাকে।

(খ) এই অতিপ্রাকৃত সত্তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ব্যক্তির মনে শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভয়, আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটে।

প্রশ্ন ৩ ▌ ধর্মের দুটি ইতিবাচক ভূমিকা উল্লেখ করো।

উত্তর : (ক) ধর্মবোধের ভিত্তিতে মানবসমাজে নানাপ্রকার নৈতিক অনুশাসন ও সামাজিক বিধি গড়ে ওঠে যার মাধ্যমে সমাজ সুশৃঙ্খল হয়।

(খ) ধর্ম সমাজে প্রচলিত নীতিবোধকে সংরক্ষণ করে এবং মানুষকে নীতিনিষ্ঠ, সহনশীল, পরোপকারী ও সহানুভূতিসম্পন্ন হতে শিক্ষা দেয়।

প্রশ্ন ৪ ▌ ধর্মের দুটি নেতিবাচক ভূমিকা উল্লেখ করো।

উত্তর : (ক) ধর্ম মানুষের মনে অন্ধবিশ্বাস ঢুকিয়ে দেয় এবং এইভাবে মানুষকে অদৃষ্টবাদী, প্রতিবাদবিমুখ, নিস্পৃহ ও নিরুদ্যম করে তোলে।

(খ) ধর্ম মানুষের জ্ঞানান্বেষণের প্রবণতাকে ধ্বংস করে, সৃজনশীল কাজে বাধা দেয় এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিরোধিতা করে।

প্রশ্ন ৫ ▌ ভারতীয় সংবিধানের কোন্ অংশে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটিকে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং কখন?

উত্তর : ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। মূল সংবিধানে এই শব্দটি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে (১৯৭৬) 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি প্রস্তাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়।

Scanned by CamScanner

প্রশ্ন ৬ | ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কী বোঝ?

উত্তর : ধর্মনিরপেক্ষতা হল এমন একটি আদর্শ যা রাজনীতিকে ধর্ম ও শিক্ষা থেকে আলাদা করে রাখে এবং যা ঈশ্বরের পরিবর্তে মানুষকে সমস্ত জাগতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখে। অবশ্য ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত 'ধর্মনিরপেক্ষ' কথাটির অর্থ হল রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করবে না এবং সব ধর্মকে সমান দৃষ্টিতে দেখবে।

প্রশ্ন ৭ | সমকালীন ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যাগুলি কী?

উত্তর : সমকালীন ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যাগুলি হল : (১) ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি, (২) ধর্মীয় মৌলবাদ, (৩) আর্থিক অনগ্রসরতা, (৪) সাম্প্রদায়িকতা, (৫) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ, (৬) বৈষম্যমূলক সংরক্ষণ নীতি, (৭) আত্মসচেতন জাতিগোষ্ঠী, (৮) অভিন্ন দেওয়ানি আইনের অনুপস্থিতি, (৯) ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার অভাব ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৮ | ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত 'ধর্মনিরপেক্ষ' কথাটির অর্থ কী?

উত্তর : ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত 'ধর্মনিরপেক্ষ' কথাটির অর্থ হল রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করবে না এবং এক ধর্ম অপেক্ষা অন্য ধর্মকে প্রাধান্য দেবে না। অর্থাৎ ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ বলতে সব ধর্মকে সমান মর্যাদা দেওয়াকে বোঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন ৯ | সাম্প্রদায়িকতা কী?

উত্তর : সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িকতা বলতে কোনো ধর্মের প্রতি গভীর প্রত্যয় বা ভালোবাসার সম্পর্ককে বোঝায়। কিন্তু বাস্তবে সাম্প্রদায়িকতা বলতে বোঝায় এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ ও প্ররোচনাদানমূলক কাজ।

প্রশ্ন ১০ | ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : ধর্মনিরপেক্ষতা হল ধর্ম থেকে রাজনীতি ও শিক্ষার পৃথকীকরণ ; ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হল রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মকে প্রাধান্য দেবে না। অপরপক্ষে সাম্প্রদায়িকতা বলতে বোঝায় কোনো বিশেষ ধর্মমতের প্রতি গভীর প্রত্যয় এবং অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ ও ঘৃণা ছড়ানো। ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি হল বস্তুবাদ, যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, পরধর্ম সহিষ্ণুতা ইত্যাদি; পক্ষান্তরে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি হল মৌলবাদ, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, হিংসা মিথ্যাচার ইত্যাদি।

প্রশ্ন ১১ | ভারতের কয়েকটি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের নাম করো।

উত্তর : হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লিগ, শিবসেনা, ইত্তেহাদুল মুসলিমেন ইত্যাদি।

প্রশ্ন ১২ | ভারতের সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষের প্রধান কারণগুলি কী?

উত্তর : ভারতের সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষের প্রধান প্রধান কারণগুলি হল—(ক) ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি, (খ) হিন্দু মৌলবাদ, (গ) মুসলিম মৌলবাদ, (ঘ) সাম্প্রদায়িক দল ও সংগঠন, (ঙ) সাম্প্রদায়িক সংবাদপত্র, সাহিত্য ও পাঠ্যপুস্তক, (চ) ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যা, (ছ) শাসকশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি, (জ) মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অনগ্রসরতা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ১৩ | ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করো।

উত্তর : (i) ভারতবর্ষে সব ধর্মকে সমান মর্যাদা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। (ii) এখানে রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে কিছু থাকবে না এবং রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করবে না।

প্রশ্ন ১৪ | ধর্মের রাজনীতিকরণ (Politicization of Religion) কী?

উত্তর : যখন কিছু সংখ্যক মানুষ নিজেদের শ্রেণিস্বার্থে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে রাজনীতিতে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারে অথবা রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে সচেষ্ট হয় তখন ধর্মের রাজনীতিকরণ ঘটে। ধর্মের রাজনীতিকরণ ঘটে গেলে মানবপ্রেম, পরধর্মসহিষ্ণুতা প্রভৃতি ধর্মের ইতিবাচক দিকগুলির স্থান অধিকার করে নেয় যুক্তিহীন ধর্মীয় লোকাচার, কুসংস্কার ইত্যাদি।

Scanned by CamScanner

প্রশ্ন ১৫ ▌ সাম্প্রদায়িকতা কীভাবে ধর্মকে ব্যবহার করে?

উত্তর : সাম্প্রদায়িকতা বিশেষ ধর্মীয় তত্ত্ব ও আচার-আচরণকে প্রশ্রয় দেয়। সাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে এক সম্প্রদায়ের মানুষকে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা হয়। সাম্প্রদায়িকতা শোষণ-ভারাক্রান্ত শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে এক ধরনের ভ্রান্ত চেতনা সৃষ্টি করে তাদের সংগ্রামী সত্তাকে সংকীর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। এককথায় সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করে কিছু সংখ্যক মানুষ তাদের শ্রেণিস্বার্থ বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়।

প্রশ্ন ১৬ ▌ সাম্প্রদায়িকতাকে 'একটি ভ্রান্ত চেতনা' বলেছেন কে এবং কেন?

উত্তর : অধ্যাপক বিপান চন্দ্র সাম্প্রদায়িকতাকে একটি ভ্রান্ত চেতনা বলেছেন, কারণ শোষক ও শোষিতের মধ্যেকার বিরোধের পরিবর্তে মানুষে মানুষে ধর্মীয় বিরোধ বা পার্থক্যকে সাম্প্রদায়িকতা সমাজের মূল বিরোধ হিসাবে তুলে ধরে। এইভাবে একটা ভ্রান্ত চেতনার উদ্ভব হয়, আর এই ভ্রান্ত চেতনার বশবর্তী হয়ে সমাজের শ্রমজীবী মানুষ একে অপরের বিরুদ্ধে আত্মঘাতি লড়াইয়ে লিপ্ত হয়।

প্রশ্ন ১৭ ▌ ধর্মবিশ্বাস ও সাম্প্রদায়িকতা কি সমার্থক?

উত্তর : ধর্মবিশ্বাস ও সাম্প্রদায়িকতা সমার্থক নয়। কারণ প্রথমত, ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে ধর্মীয় তত্ত্ব ও আচার-বিচারের গভীর সম্পর্ক থাকে, আর সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ বেশি থাকে। দ্বিতীয়ত, প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসী মানুষ পরকালমুখী হয়, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে ইহলোকের লাভলোকসানের হিসাব বেশি থাকে। তৃতীয়ত, একজন প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসী মানুষ অন্যের বিরোধিতা বা ক্ষতিসাধন করে না, অপরপক্ষে অন্যের বিরুদ্ধাচরণ ও ক্ষতিসাধনের প্রচেষ্টার মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ ও পরিণতি।

প্রশ্ন ১৮ ▌ সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো। এই ধারণাটির সঙ্গে কার নাম যুক্ত?

উত্তর : জওহরলাল নেহরু হিন্দু **সাম্প্রদায়িকতাকে সংখ্যাগরিষ্ঠের** সাম্প্রদায়িকতা এবং মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে সংখ্যালঘিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতা বলে আখ্যা দেন। তিনি প্রথমটিকে দ্বিতীয়টি অপেক্ষা অনেক বেশি ভয়ংকর বলে মনে করতেন, কারণ তাঁর মতে, প্রথমটি অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী এবং প্রয়োজনে ভারতে ফ্যাসিবাদ কায়েম করতে পারে।

বিষয়মুখী প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১

১ *'ধর্ম' শব্দটির কোন্ ধাতু থেকে উৎপত্তি?*
উত্তর : 'ধৃ' ধাতু থেকে।

২ *ইংরেজি 'religion' শব্দটি কোন্ শব্দ থেকে উৎপত্তি?*
উত্তর : ল্যাটিন শব্দ 'religare' থেকে।

৩ *'ধর্ম হল আমজনতার আফিম স্বরূপ' —উক্তিটি কার?*
উত্তর : কার্ল মার্কস-এর।

৪ *ধর্মবিবর্জিত রাজনীতিকে মৃত্যুফাঁদ (death-trap) বলেছেন কে?*
উত্তর : গান্ধিজি।

৫ *ভারতীয় সংবিধানের কোন্ অংশে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি স্থান পেয়েছে এবং কত সালে?*
উত্তর : প্রস্তাবনায় ; ১৯৭৬ সালে।

৬ *ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মনিরপেক্ষীকরণের মধ্যে মূল পার্থক্য কী?*
উত্তর : ধর্মনিরপেক্ষতা হল একটি মতাদর্শ ও ধর্ম-নিরপেক্ষীকরণ হল একটি প্রক্রিয়া।

৭ *ভারতীয় সংবিধানের কত নং সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটিকে প্রস্তাবনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়?*
উত্তর : ১৯৭৬ সালের ৪২ নং সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে।

৮ *ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ভারতীয় সংবিধানের কয়েকটি ধারার উল্লেখ করো।*
উত্তর : সংবিধানের ১৫, ১৬, ১৭, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮ ইত্যাদি ধারাগুলি।

৯ **Communalism in Modern India** *গ্রন্থটি কার লেখা?*
উত্তর : বিপান চন্দ্র-এর লেখা।

১০ **"Communalism in India"** *গ্রন্থটি কার লেখা?*
উত্তর : ইঞ্জিনিয়ার এবং শাকির (A. Engineer and M. Shakir)-এর লেখা।

Scanned by CamScanner

১১ 'সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ' প্রবন্ধটি কার লেখা?
উত্তর : রণেন সেন-এর লেখা।

১২ সনাতন হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী হয়েও হিন্দু-মুসলমানকে ভাই-ভাই বলে মনে করতেন কে?
উত্তর : গান্ধিজি।

১৩ মুসলিম লিগের কোন্ অধিবেশনে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রগঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়?
উত্তর : লাহোর অধিবেশনে (মার্চ, ১৯৪০)।

১৪ 'হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের রাজদূত'—কাকে উদ্দেশ্য করে কে বলেছিলেন?
উত্তর : জিন্না-কে উদ্দেশ্য করে গোখেল বলেছিলেন।

১৫ সাম্প্রদায়িকতাকে 'ভ্রান্ত চেতনা' বলেছেন কে?
উত্তর : বিপান চন্দ্র।

১৬ 'We or Our Nationhood Defined' গ্রন্থটি কার লেখা?
উত্তর : গোলওয়লকরের।

১৭ 'সারা ভারত মুসলিম লিগ'—কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর।

১৮ কোন্ ধর্ম ঈশ্বর সম্পর্কে উদাসীন?
উত্তর : বৌদ্ধধর্ম।

খ বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর MCQ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১

১ ইংরেজি 'Religion' শব্দটির উৎপত্তি—
(ক) গ্রিক শব্দ থেকে **(খ) ল্যাটিন শব্দ থেকে**
(গ) ফরাসি শব্দ থেকে (ঘ) সংস্কৃত শব্দ থেকে

২ 'The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism', গ্রন্থটির প্রণেতা—
(ক) ম্যাক্স ওয়েবার (খ) কার্ল মার্কস
(গ) স্পেনসার (ঘ) ম্যাকাইভার

৩ 'ধর্ম হল আমজনতার আফিম স্বরূপ', উক্তিটি করেন—
(ক) লেনিন **(খ) মার্কস**
(গ) এঙ্গেলস (ঘ) ম্যাক্স ওয়েবার

৪ 'The concept of Secular State and India— গ্রন্থটির লেখক
(ক) লিও ফেফার (খ) এমিল ডুর্কহেইম
(গ) ম্যাক্স ওয়েবার **(ঘ) ভি.পি.লুথেরা**

৫ 'ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে পৃথকীকরণকে বোঝায়', উক্তিটি করেন—
(ক) রবার্ট মেলসন (খ) ভি.আর.মেহতা
(গ) লিও ফেফার (ঘ) লুথেরা

৬ ধর্মবিবর্জিত রাজনীতিকে মৃত্যুফাঁদ (death-trap) বলেছেন—
(ক) বিপান চন্দ্র **(খ) গান্ধিজি**
(গ) ভি.আর.মেহেতা (ঘ) সাভারকার

৭ ভারতীয় সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি স্থান পেয়েছে সংবিধানের—
(ক) প্রস্তাবনায়
(খ) মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে
(গ) সপ্তম তপশিলে
(ঘ) নির্দেশমূলক নীতিতে

৮ 'কোনো সম্প্রদায়ের নিজ অস্তিত্বকে রাজনৈতিকভাবে জাহির করাই হল সাম্প্রদায়িকতা', উক্তিটি করেন—
(ক) ম্যাক্স ওয়েবার (খ) বিপান চন্দ্র
(গ) এ. আর দেশাই **(ঘ) মেলসন এবং উলপে**

৯ ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ভারতীয় সংবিধানের দুটি ধারা হল—
(ক) ১২ ও ১৩ (খ) ১৭ ও ১৮
(গ) ২৫ ও ২৬ (ঘ) ৩৪ ও ৩৫

১০ 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি ভারতীয় সংবিধানে স্থান পেয়েছে কত তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে?
(ক) ২৫তম **(খ) ৪২তম**
(গ) ৪৪তম (ঘ) ৫৮তম

১১ 'India has a secular state', উক্তিটি করেন—
(ক) বিপান চন্দ্র (খ) রজনী কোঠারী
(গ) নেহরু (ঘ) ডি.ই.স্মিথ

১২ ঈশ্বর সম্পর্কে উদাসীন একটি ধর্ম হল—
(ক) জৈন (খ) হিন্দু
(গ) বৌদ্ধ (ঘ) মুসলিম

১৩ সাম্প্রদায়িকতাকে 'ভ্রান্ত চেতনা' বলেছেন—
(ক) বিপান চন্দ্র (খ) এ.আর.দেশাই
(গ) সাভারকার (ঘ) ডি.ই.স্মিথ

১৪ ধর্মনিরপেক্ষতার জনক বলা হয়—
(ক) গান্ধিজিকে **(খ) জর্জ জেকব হলোয়েককে**
(গ) এঙ্গেলস্কে (ঘ) ডি.ই.স্মিথকে

১৫ 'যাঁরা বলেন ধর্ম ও রাজনীতি মানুষের জীবনের দুটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন দিক, তাঁরা শুধু হাসির খোরাক জোগান', উক্তিটি করেন—
(ক) শ্রী অরবিন্দ **(খ) গান্ধিজি**
(গ) গোলওয়লকর (ঘ) জিন্না

Scanned by CamScanner

১৬ *ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী কোন্ ধর্মের লোকেরা সঙ্গে 'কৃপাণ' রাখতে পারেন—*
(ক) মুসলমান (খ) হিন্দু
(গ) বৌদ্ধ (ঘ) শিখ

১৭ **'Communalism in Modern India'** *গ্রন্থটির প্রণেতা—*
(ক) মার্ক গ্যালাস্টার (খ) বিপান চন্দ্র
(গ) কৌসার আজম (ঘ) অরুণা আহ্‌মেদ

১৮ *'দাঙ্গাবাজেরা ধর্ম সৃষ্টি করে না, অন্যের উৎপাদিত ধর্ম কেড়ে নেয়, দেশের অর্থনীতিকে দুর্বল করে, রাজনীতিকে করে বিষাক্ত .....', উক্তিটি করেন—*
(ক) অম্লান দত্ত (খ) অমর্ত্য সেন
(গ) বিপান চন্দ্র (ঘ) এম. আর. এ. বেগ

১৯ **"Communalism in India',** *গ্রন্থটির প্রণেতা—*
(ক) বিপান চন্দ্র (খ) কৌসার আজম
(গ) ইঞ্জিনিয়র ও সাকির (ঘ) অম্লান দত্ত

২০ *'দ্বিজাতি তত্ত্ব'-এর অন্যতম প্রধান প্রবক্তা—*
(ক) গান্ধিজি
(খ) নেহেরু
(গ) কৃপালণী
(ঘ) মহম্মদ আলি জিন্না

২১ *১৯৪০ সালে অনুষ্ঠিত 'সারা ভারত মুসলিম লিগ'-এর ২৭তম অধিবেশনে 'দ্বি-জাতি তত্ত্বটি পেশ করেন—*
(ক) অরুণা আহ্‌মেদ (খ) জিন্না
(গ) আজাদ (ঘ) সৈয়দ আলি ইমাম

২২ *'হিন্দুত্ব' (১৯২৯), 'হিন্দু রাষ্ট্রদর্শন' (১৯৩৭) প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা—*
(ক) বি. ডি. সাভারকার
(খ) গোলওয়লকর
(গ) দীনদয়াল উপাধ্যায়
(ঘ) শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি

Suggested Readings:

1. Abbas, H., Kumar, R. & Alam, M. A. (2011) *Indian Government and Politics.* New Delhi: Pearson, 2011.
2. Chandhoke, N. & Priyadarshi, P. (eds.) (2009) *Contemporary India: Economy, Society, Politics.* New Delhi: Pearson.
3. Chakravarty, B. & Pandey, K. P. (2006) *Indian Government and Politics.* New Delhi: Sage.
4. Chandra, B., Mukherjee, A. & Mukherjee, M. (2010) *India After Independence.* New Delhi: Penguin.
5. Singh, M.P. & Saxena, R. (2008) *Indian Politics: Contemporary Issues and Concerns.* New Delhi: PHI Learning.
6. Vanaik, A. & Bhargava, R. (eds.) (2010) *Understanding Contemporary India: Critical Perspectives.* New Delhi: Orient Blackswan.
7. Menon, N. and Nigam, A. (2007) *Power and Contestation: India Since 1989.* London: Zed Book.
8. Austin, G. (1999) *Indian Constitution: Corner Stone of a Nation.* New Delhi: Oxford University Press.
9. Austin, G. (2004) *Working of a Democratic Constitution of India.* New Delhi: Oxford University Press.
10. Jayal, N. G. & Maheta, P. B. (eds.) (2010) *Oxford Companion to Indian Politics.* New Delhi: Oxford University Press.

Scanned by CamScanner